সেবক

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের দ্বিমাসিক পত্রিকা ৮ পাতা

কলকাতা ৩০ বৈশাখ ১৪২২ ● বৃহস্পতিবার ১৪ মে ২০১৫ ● ২ টাকা

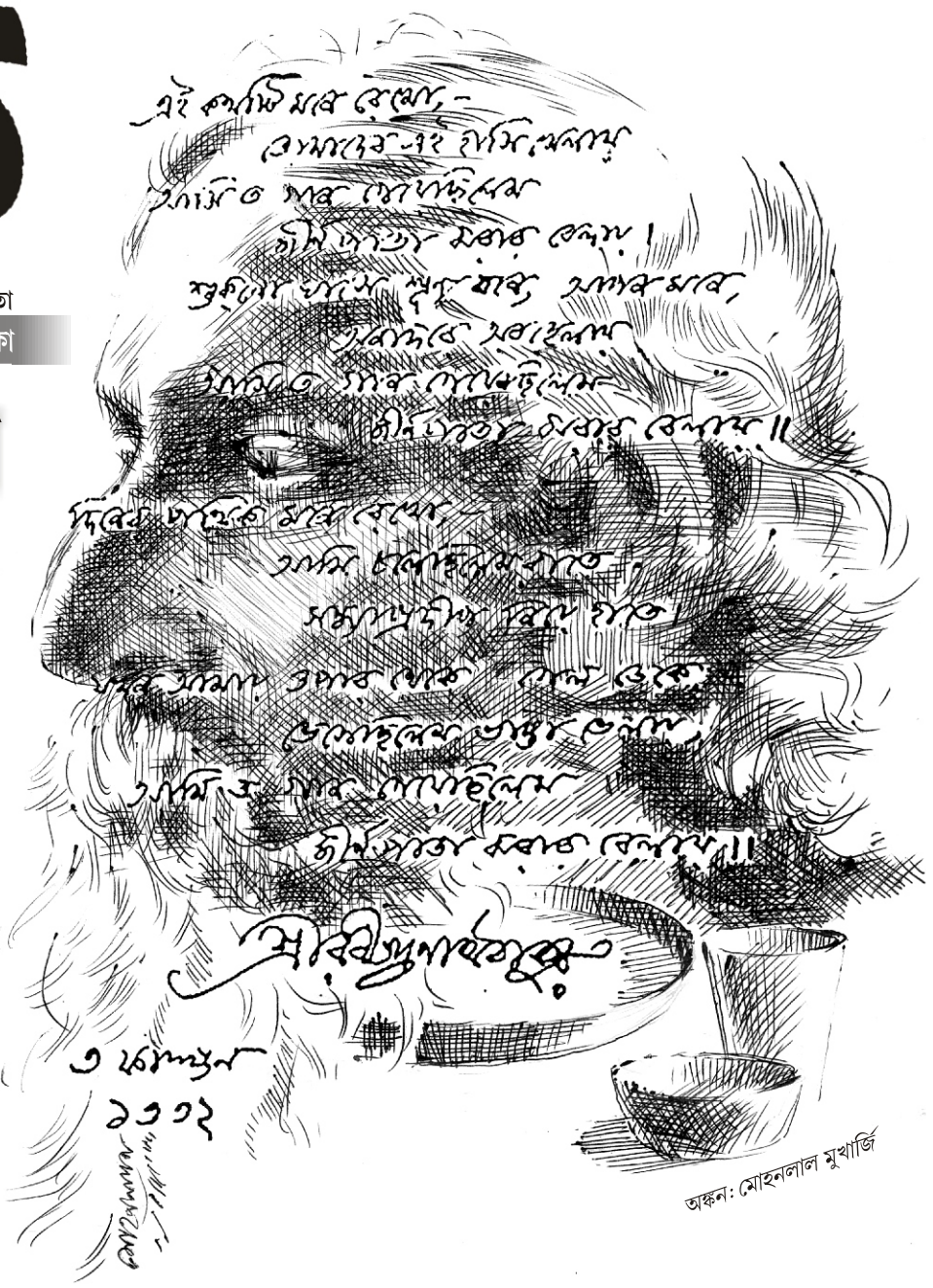

শান্তিনিকেতনে বর্ষবরণ উৎসব

জবা গুহ ঠাকুরতা

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমার এক নিবিড় সম্পর্ক সেই শিশুবেলা থেকে। আমার যখন মাত্র ৯ বছর বয়স, তখন আমি সেখানে যাই এবং আমার শিক্ষালাভের বেশিরভাগ সময়টাই সেখানে কাটে। প্রায় ১১/১২ বছর। শান্তিনিকেতনে যারা পাঠভবনে পড়াশোনা করে, তারা জীবনের কত মূল্যবান ঐতিহ্য কত অনায়াসে যে নিজের মধ্যে আয়ত্ত করতে পারে তা দেখবার ও শেখবার মতই। সেখানে ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতিদিন কিছু না কিছু নতুনত্বের ছোঁয়া পেতাম। প্রকৃতির বৈচিত্র, মানুষের বৈচিত্র, অনুষ্ঠানের বৈচিত্র, সব মিলেমিশে এক অপূর্ব জীবনধারা সেখানে পেয়েছি। কত কিছু যে দেখেছি, শিখেছি, আনন্দ করেছি -- স্মৃতির মণিকোঠায় সযত্নে সঞ্চিত আছে। আজ শান্তিনিকেতন আমার অত্যন্ত প্রিয় জায়গা, যেখানে গেলে মন স্বাভাবিকভাবে খুশিতে ভরে থাকে।

শান্তিনিকেতনে বারো মাসে তেরো পার্বণ। এই যেমন বর্ষবরণ, বসন্তোৎসব, রবীন্দ্র জন্মোৎসব, বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ, রবীন্দ্র সপ্তাহ, বর্ষামঙ্গল, আনন্দমেলা, নন্দন উৎসব, পৌষমেলা -- সারা বছর ধরেই। এছাড়া ছোটো ছোটো সাহিত্য সভা, নাটক, গান-বাজনার অনুষ্ঠান তো নিয়মিত ভাবেই চলতে থাকে।

প্রত্যেকটি উৎসবই তার নিজস্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। আমি এখানে শান্তিনিকেতনে বর্ষবরণ কিভাবে উদ্‌যাপিত হয় তার একটি বিবরণ দিচ্ছি। পুরনো বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নেবার যে সুন্দর প্রক্রিয়া, তা অত্যন্ত অভিনব এবং মনোগ্রাহী। শান্তিনিকেতনের বর্ষবরণ উদ্‌যাপন গুরুদেবের সময় থেকে যেভাবে আরম্ভ হয় তা অনেকটা আজও অপরিবর্তিত।

রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব ব্রাহ্ম সমাজে নববর্ষ উৎসবের প্রবর্তন করেন। মানুষের মধ্যে সামাজিক যোগ নিবিড় করার মানসে। শান্তিনিকেতনে গুরুদেব নববর্ষের উৎসবকে পূর্ণতা দিয়েছিলেন মিলন ও ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করে। আশ্রমের প্রথম নববর্ষের অনুষ্ঠান হয় ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ, সোমবার, ইং ১৪ ই এপ্রিল, ১৯০২ সালে। এই উপলক্ষে বিশেষ বন্ধুজনকে আহ্বান করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁর আহ্বানে আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মোহিতচন্দ্র সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমুখ বিদগ্ধ গুণীজন। কবি নববর্ষে ভাষণ দেন, ভাষণটির মূল কথা ছিল --আমরা যদি ঈশ্বরের অক্ষয় আনন্দ অন্তরে উপলব্ধি করি, তাহলে সংসারের বাহ্য ঘটনা আমাদের অভিভূত করতে পারে না। সুখ, দুঃখ, বিরহ, মিলন, লাভ, ক্ষতি, জন্ম, মৃত্যু -- সবই সাংসারিক বাহ্য ঘটনা ও তাৎক্ষণিক মাত্র। আনন্দ স্বরূপ ঈশ্বরের বোধই শাশ্বত। নববর্ষ উপলক্ষে কবি গানও রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রার্থনা -- ''দাও আমাদের অভয় মন্ত্র/অশোক মন্ত্র তব/দাও আমাদের অমৃত মন্ত্র/দাওগো জীবন নব।''*

এরপর ৭ পাতায়

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবার

নীতিশ মুখার্জি

ঊনিশ শতকের পূর্বাভাস। ইস্ট ইন্ডিয়ার বাণিজ্য প্রবাহ দেশজুড়ে, সাগর-নদী পেরিয়ে সেদিনের আদি কলকাতার গোবিন্দপুরের গঙ্গায় এসে দাঁড়াত বাণিজ্য-তরী। বাণিজ্য-তরী থেকে বিভিন্ন মালপত্তর খালাস করতেন পঞ্চানন কুশারী বলে একজন মানুষ -- যাঁর দূরদৃষ্টি এবং সাংসারিক নিয়ম কানুন ভালভাবেই রপ্ত ছিল। তিনি জগন্নাথ কুশারীর বংশধর। জগন্নাথ কুশারী ছিলেন কুশীরীয়ার ভট্টনারায়ণের পুত্র দীন কুশারীদের বংশের অতি নিকট শরিক। ক্ষিতিশূরের কাছ থেকে বর্ধমানের 'কুশ' নামক গ্রামের আধিপত্য পেয়েই দীন 'কুশারী' এই পদবীর ধারক হলেন। জগন্নাথ কুশারী দীন কুশারীর দশম পুরুষ।

পঞ্চানন কুশারী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জাহাজে মাল ওঠানো ও নামানোর বিষয়ে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন। সে সময় কলকাতা ও সুতানুটিতে শেঠ বণিকদের রমরমা। মাল ওঠানো ও নামানোর কাজের জন্য শ্রম খুব গভীর ও দায়িত্বপূর্ণ ছিল। তার জন্য স্বাভাবিকভাবে নিম্নস্থানীয় লোকদের শ্রম দিয়েই তা করা হোত - কিন্তু পঞ্চানন তাতে গভীর নজর রাখতেন যাতে ওঠা-নামার কাজে কোনও বিলম্ব বা মাল এদিক ওদিক না হয়। শ্রমদানকারীরাও পঞ্চানন কুশারীকে মান্য করতেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম উল্লেখ না করে তাঁকে 'ঠাকুর মশায়' বলে সম্বোধন করতেন এবং নির্দেশ নিতেন। এইভাবে তীরে লাগা জাহাজের কাপ্তেনরাও তদারকী পঞ্চনন কুশারীকে 'ঠাকুর-টেগোর' বলে সম্বোধন করতেন। এমনিভাবেই 'কুশারী' নাম অবশেষে 'ঠাকুর' বা 'টেগোর' এই ভাবেই সর্বত্র, বিশেষ করে গঙ্গার পারে জাহাজ-মেলায় প্রচারিত হয়ে গেল -- পঞ্চানন ঠাকুর।

পঞ্চানন ঠাকুরের এক পুত্র জয়রাম ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে সঙ্গে পিতার কাজ দেখাশোনা করতেন -- তাতে বণিকদের কাছ থেকে তাদের চলিত-ভাষা ইংরেজি শেখেন। যদিও জয়রাম পারসী ভাষাও নিয়মিত ব্যবহার করতেন। জয়রাম এভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বণিকদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন এবং আর্থিক সঙ্গতিতে বেশ ভারী হয়ে উঠলেন। তাছাড়া তিনি কলকাতার জরিপ কাজে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সহযোগিতায় 'আমিন পদে'ও নিযুক্ত হলেন। জয়রাম ধীরে ধীরে বণিক সাহেবদের নজরে আসলেন, এবং কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের নিকটবর্তী স্থানে একটি 'বাগানবাড়ি' নির্মাণ করলেন। জয়রামের দ্বিতীয় পুত্র নীলমণি ঠাকুরের সময় থেকেই জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির পত্তন। নীলমণির মৃত্যুর পর সংসার ব্যবস্থাদির ভার এল বড় ছেলে রামলোচনের ওপর। অনেক বিষয় সম্পত্তির অধিকারী রামলোচনের কোনও সন্তান ছিল না। তিনি দ্বিতীয় ভাই রামমণির প্রথম পক্ষের স্ত্রী মেনকার চতুর্থ পুত্র সন্তান দ্বারকানাথকে 'দত্তক' নিয়েছিলেন। জীবনের প্রথম থেকেই ওই সমাজে সঙ্গীত ও মজলিসে রামলোচন ঠাকুর একজন বিখ্যাত স্বনামধন্য আভিজাত্যপূর্ণ ভদ্রলোক ছিলেন।

এরপর ৩ পাতায়

বিশেষ সংবাদ গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালের বহির্বিভাগের শুভারম্ভ হচ্ছে আগামী ২৪শে মে, ২০১৫, রবিবার, সকাল ৯-৩০ মিনিট থেকে ● *বিস্তারিত ৮ পাতায়*

আমাদের সেবা নিবাস

গৌতম সাহা

কিছুদিন আগে এক সন্ধ্যায় হঠাৎ করে সুসময়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ও তখন গান্ধী সেবা সংঘের সামনে দাঁড়ানো ঝালমুড়িওয়ালা উত্তমের সাথে গল্পো করছে। সুসময় ক্লাস এইটে পড়া সুঠাম চেহারার প্রাণচঞ্চল এক কিশোর, পুরো নাম সুসময় চন্দ, বাড়ি বহরমপুর। ওকে অনেক দিন পর দেখে বেশ ভালো লাগলো। সুসময়ের মা জানালো ওর ডাক্তারি চেক আপের জন্য কলকাতায় আসা। ডাক্তারবাবু জানিয়েছেন সুসময় এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। খুব আনন্দের কথা।

এবার বোধহয় একটু খুলে বলার সময় এসেছে। খুব অল্পবয়েসে, স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার আগেই বেশ অসুস্থ হয়ে পরলো সুসময়। বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ধরা পরলো রোগটি সাধারণ কিছু নয়, ছোট্ট সুসময় ব্লাড ক্যানসারের রোগী। অতি সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার, সুসময়ের বাবা স্থানীয় এক বেসরকারী সংস্থার সামান্য এক কর্মচারী। আর্থিক সমস্যা থাকলেও সুসময়কে ঘিরে বেশ আনন্দেই দিন কাটছিল চন্দ পরিবারের। কিন্তু পরিবারের সবচেয়ে ছোট্ট সদস্যটি এখন ক্যানসারে আক্রান্ত। এর চেয়ে বড় দুঃসময় আর কি হতে পারে!

তবে এ জেনে তো ঘরে বসে থাকা যায়না। সকলের প্রিয় সুসময়ের জন্য এগিয়ে এলো পাড়া প্রতিবেশী আর আত্মীয় পরিজন। শুরু হল এক অনিশ্চিত সংগ্রাম। সহায়ক রূপে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলো বহরমপুরের কিছু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা। কোলকাতায় ডাক্তার দেখানো হল। ডাক্তারবাবু বলেই দিলেন চিকিৎসার জন্য সুসময়কে দীর্ঘদিন কলকাতায় থাকতে হবে। ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, টাকা নেই, পয়সা নেই, কিন্তু বিনা যুদ্ধে হেরে যেতেও রাজী নয় কেউই। সামনে সমস্যার পাহাড়; এর মধ্যে এক বড় সমস্যা কলকাতার মত আত্মীয়হীন শহরে মাসের পর মাস কম খরচে থাকার জায়গা জোগাড় করা। সল্টলেক এডি স্কুলের হেডমাস্টারমশাই শ্যামল ভট্টাচার্য তখন নান্দীকারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাজ্যের স্কুলের ছেলে মেয়েদের নাট্য চর্চ্চা নিয়ে কাজ করছিলেন। সেই সুত্রে খবর পেয়ে সুসময়ের বাবা যোগাযোগ করলেন গান্ধী সেবা সংঘের সঙ্গে। তারপর একদিন অসুস্থ, রুগ্ন সুসময়কে নিয়ে চন্দ পরিবার এসে উঠলেন গান্ধী সেবা সংঘের সেবা নিবাসে। শুর হল সুসময়ের চিকিৎসার অনিশ্চিত, অনন্তপ্রায় এক অধ্যায়। চিকিৎসা চললো দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, মাস গড়িয়ে বছর। চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে নিঃস্তেজ সুসময় এক সময় একটু একটু করে সজীব হতে শুরু করলো। সেবা নিবাসের ঘর, সামনের বড় বারান্দা আর লাইব্রেরীতে বসে পড়াশুনা আর ছবি আঁকতে লাগলো সুসময়। একতলার মাণিক্য মঞ্চের অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করতে খুব আগ্রহ তার। এমন করে একসময় গান্ধী স্কুলে ভর্তি হয়ে নিয়মিত ক্লাসে যেতে শুরু করলো সুসময়। একদিন ডাক্তারবাবু জানালেন সুসময় এখন রোগমুক্ত। কি আনন্দ, কি আনন্দ! প্রায় সাড়ে চার বছর পর, এমনই এক আনন্দের দিনে সুসময়কে নিয়ে চন্দ পরিবার ‘সেবা নিবাস’ ছেড়ে পাড়ি দিলেন বহরমপুরে নিজের বাড়ীর পথে। এখনও কলকাতায় ডাক্তারী চেক আপ করতে এসে সুযোগ পেলেই সুসময় গান্ধী সেবা সংঘে আসে সবার সঙ্গে দেখা করতে।

দীর্ঘ দুঃসময় পেরিয়ে, গভীর অসুখ সারিয়ে সুসময়ের এই সেরে ওঠার কাহিনীর সবচেয়ে বড় ভূমিকা অবশ্যই তার চিকিৎসক, তার বাবা মা ও নিকট জনদের। সে তুলনায় সামান্য হলেও তাদের কলকাতায় থাকার বন্দোবস্ত করার মাধ্যমে গান্ধী সেবা সংঘও সুসময়ের এই ক্যানসার জয়ের সাফল্যের এক অংশীদার।

তাহলে এবার ‘সেবা নিবাস’ নিয়ে কিছু কথা শোনা যাক। এ পর্য্যন্ত যে পাঁচশোর বেশী ক্যানসার রোগী, যারা বিভিন্ন সময়ে গান্ধী সেবা সংঘের সেবা নিবাসে থেকেছেন, তাদের পরিবার পরিজন, যারা এই ক্যানসার রোগীদের এই আবাসটি গড়ে তুলতে আর্থিক ও কায়িক সাহায্য করেছেন এবং পরামর্শ দিয়েছেন, কিছু বিশেষজ্ঞ ক্যানসার চিকিৎসক ও গান্ধী সেবা সংঘের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ী ছাড়া এখনও পর্য্যন্ত বেশীর ভাগ মানুষ সংঘের এই প্রয়াস বা উদ্যোগের কথা জানেন না। সারা রাজ্যের দূরদূরান্ত থেকে আসা অসংখ্য ক্যানসার রোগী, যারা কলকাতার, বিশেষত উত্তর ও মধ্য কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে দীর্ঘ চিকিৎসার জন্য থাকতে বাধ্য হন, তাদের স্বার্থেই গান্ধী সেবা সংঘের সেবা নিবাসের কথা ব্যাপক ভাবে প্রচার করা প্রয়োজন।

‘সেবা নিবাস’ শুরুর ভাবনা

গান্ধী সেবা সংঘের কার্যকরী সমিতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ডাঃ অসীম চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘকাল তারই আবিষ্কৃত সোরিনাম থেরাপীকে অস্ত্র করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের, বিশেষতঃ প্রান্তিক ও দুঃস্থ ক্যানসার রোগীদের নিয়ে গবেষণা ও চিকিৎসা করে চলেছেন। ডাঃ জয়দীপ বিশ্বাস, ডাঃ অনুপ মজুমদার, ডাঃ সুবীর গাঙ্গুলী, ডাঃ গৌতম মুখার্জী, ডাঃ শঙ্কর নাথ সহ বহু খ্যাতিমান ক্যানসার বিশেষজ্ঞ তার এই কাজের অন্যতম সহায়ক। সেই সুবাদে এদের অনেকেই গান্ধী সেবা সংঘে বিভিন্ন সময়ে ক্যানসার বিষয়ক অনেকগুলি আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন। ক্যানসার রোগের ভয়াবহতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা ও সম্ভাব্য মহামারীর বিপদের গুরুত্ব বিবেচনা করে গান্ধী সেবা সংঘ কয়েকটি কর্মসূচী গ্রহণ করে। তারই প্রথম পদক্ষেপ ক্যানসার কাউন্সেলিং ও গাইডেন্স সেন্টার গড়ে তোলা।

২০০৪ সালে কেন্দ্রটির উদ্বোধন করলেন তৎকালীন পৌরপ্রধান শ্রী শ্রীহীর ভট্টাচার্য। এবার আরও বড় কিছু করার ভাবনা চিন্তা শুরু হল। ক্যানসারের মত কঠিন ও ব্যয়বহুল চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলা গান্ধী সেবা সংঘের সাধ্যাতীত। ডাঃ সুবীর গাঙ্গুলীর মত অনেকেই জানালেন প্রতিদিন রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে বহু ক্যানসার রোগী কেমোথেরাপি ও রেডিয়েশনের জন্য সরকারী হাসপাতাল গুলিতে আসেন। এদের এক বড় অংশ অতি সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষ; কেউ বা চিকিৎসার খরচ যোগাতে গিয়ে নিঃস্ব হন। এই সব রোগীদের পক্ষে কলকাতায় দীর্ঘদিন থাকার ব্যাবস্থা করা প্রায় অসম্ভবই। বাধ্য হয়ে অনেকেই হাসপাতাল চত্তরেই পথের পাশে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাতের পর রাত কাটান। ডাক্তারবাবুরা এব্যাপারে সংঘকে ভাবতে বললেন। যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। সিদ্ধান্ত হল সংঘ দোতলায় ক্যানসার রোগীদের থাকবার জন্য কয়েকটি ঘর তৈরী করবে। গান্ধী সেবা সংঘের মত সাধারন এক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ এক কঠিন কাজ। প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা দরকার, অথচ ভাঁড়ার শূন্য। সাহস যোগালেন তখনকার সংঘ সভাপতি, স্বাধীনতা সংগ্রামী মনি চক্রবর্তী। অযাচিত ভাবে প্রথম সাহায্য পঞ্চাশ হাজার টাকা এলো বালীর বাসিন্দা বি এস এন এল এর অফিসার দেবেন্দ্র পাঠকের কাছ থেকে, বাবা প্রভাস পাঠকের স্মৃতিতে। এরপর পৃথা দাসগুপ্ত স্মৃতি রক্ষা কমিটি, মৃত্যুঞ্জয় সাহা ও রেণুকা সাহার স্মৃতিতে অশোক সাহা ও হেমেন্দ্র লাল কুন্ডু ও লাবণ্য প্রভা কুন্ডুর স্মৃতিতে রঘুনাথ কুন্ডু অন্য তিনটি ঘরের জন্য দান করলেন। হাতে দুলক্ষ টাকা আসতেই কাজ শুরু হয়ে গেল। পরিকল্পনা শুনে এর পর অনেকেই এগিয়ে এলেন স্বতস্ফূর্ত হয়ে। সক্রিয় ভাবে কাজে হাত লাগালেন সংঘ পরিবার। প্রায় ছয় লক্ষ টাকা খরচে তৈরী হল চারটি বাথরুম সহ ঘর ও একটি প্রায় আটশো স্কোয়ার ফিটের ঝকঝকে হল বা লাউঞ্জ। ঁকীর্তিচন্দ্র দাঁ ও ঁসত্যরানী দাঁ স্মৃতিতে হলের নামকরন হল। ঁউষারানী দেবীর স্মৃতিতে দান করলেন সংঘের সভাপতি শ্রী মনি চক্রবর্তীর পুত্ররা। এছাড়া ফ্রান্সের প্ল্যানেট ক্যায়ার, অগ্নি সোলার এবং বহু মানুষের ব্যক্তিগত দানে নির্মাণ সম্পূর্ণ হল। দুঃস্থ ক্যানসার রোগীদের জন্য উৎস্বর্গীত আবাসটির নাম দেওয়া হল ‘সেবা নিবাস’। ২০০৫ এরই আগস্টে মহা উৎসাহে উদ্বোধন হল সেবা নিবাস। উদ্বোধক স্থানীয় বিধায়ক ও রাজ্যমন্ত্রী শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী। শুরু হল পথ চলা। অভিজ্ঞতার অভাব, অজ্ঞতা, স্বেচ্ছাসেবীর অভাব, ক্যানসার সম্মন্ধে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা - এমন নানা বাঁধা কাটিয়ে ধীরে ধীরে ক্যানসার রোগীদের কাছে পরিচিত হল আবাসটি। রোগীর সংখ্যা বাড়তেই থাকলো, আর দানের অর্ঘ্য নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকলেন সাধারণ মানুষজন। স্থানীয় ব্যবসায়ী প্রদীপ বর্মণ দিলেন টিভি, সঙ্গে ফ্রী কেবল কানেকশন, কানারা ব্যাঙ্ক, ইউ বি আই দিলেন ফ্রিজ, অ্যাকোয়া গার্ড। অন্যন্য সাহায্যও আসতে থাকলো। একসময় জায়গার অভাব হতে একটু রদবদল করে একটি বড় ঘরকে আট বেডের ডর্মেটরী বানানো হল। এখন রোগী ও তাদের সাথীদের নিয়ে মোট শয্যা সংখ্যা বেড়ে হল ষোলো। কিন্তু বিশাল চাহিদার তুলনায় এ কিছুই নয়। এমন সময় ২০১১ সালে বালীর দেবেন্দ্র পাঠক আবার দুলক্ষ টাকা দান করলেন। নতুন চিন্তা ভাবনা শুরু হল। তৎকালীন সাংসদ শ্রী অমিতাভ নন্দী দিলেন এক লক্ষ। স্টেট ব্যাঙ্ক অব পাতিয়ালা পাঠালেন পঞ্চাশ হাজার। এখন প্রয়াত ঁতিনুলাল দত্ত বণিক যোগালেন প্রয়োজনীয় প্লাই বোর্ড; শ্রী পৃথিপতি চক্রবর্ত্তী দিলেন খাট বানানোর খরচ; জোশি চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, ডঃ হিরন্ময় সাহা, শ্রীমতি মঞ্জু মুখার্জী আর্থিক সাহায্য করলেন, সাহায্য করলেন আরও অনেকেই। ২০১২ সালে সাত লক্ষ টাকা খরচ করে তিনতলায় তৈরী হল ছ’টি কেবিন আর একটি তিনশো স্কোয়ার ফিটের কমন রান্না ঘর। ২রা অক্টোবর সাংসদ শ্রীমতি কাকলি ঘোষ দস্তিদার, বিধায়ক শ্রী সুজিত বোস ও অসংখ্য শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতিতে এই অংশের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

না! এখানেই থেমে থাকার কোনো উপায় নেই। সেবা নিবাসে আবাসিকের সংখ্যা যেমন বাড়তে থাকলো নতুন নতুন মানুষজন এগিয়ে এলেন, অর্থ দান করলেন। স্বাভাবিক ভাবেই দ্বায়িত্ব বাড়লো। সেবা নিবাসের ঘরের সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হল। আর কয়েক দিনের মধ্যেই এগারোটি নতুন ঘর রোগীদের থাকবার উপযোগী হয়ে যাবে। এ পর্য্যন্ত সাত লক্ষ টাকার বেশী খরচ হয়ে

এরপর ৩ পাতায়

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি

অঞ্জন চক্রবর্তী

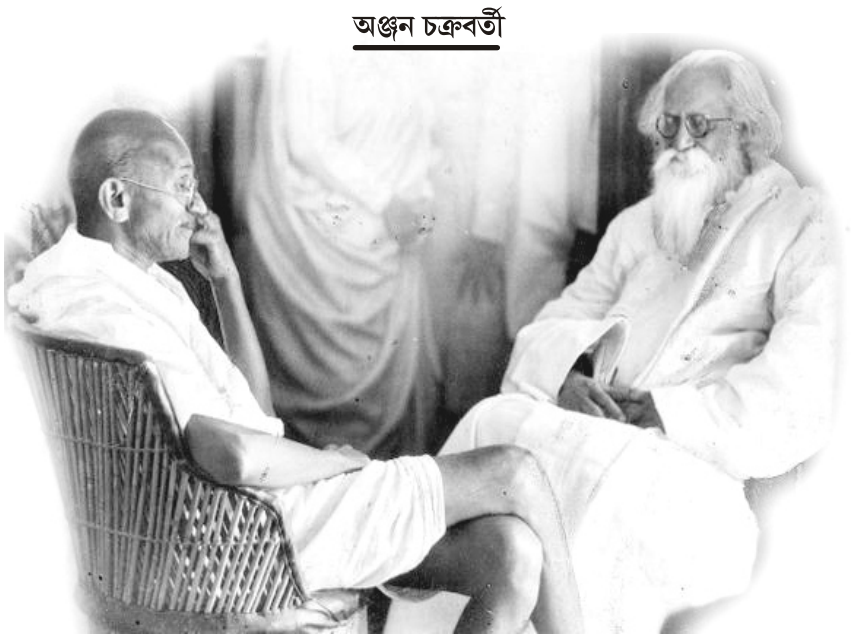

মহাত্মা নম্র অহিংসনীতি গ্রহণ করেছেন, আর চতুর্দিকে তাঁর জয় বিস্তীর্ণ হচ্ছে। তিনি যে নীতি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন, সম্পূর্ণ পারি বা না-পারি, সে নীতি আমাদের স্বীকার করতেই হবে।

(মহাত্মা গান্ধী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন, ৬ আশ্বীন, ১৩৪৪)

গান্ধীর লড়াইয়ের অস্ত্রও ছিল অহিংসা। শাসকের অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে অহিংসা-মন্ত্রকে বুকে নিয়েই প্রতিবাদে এগিয়ে যেতেন। তাঁর এই লড়াইয়ের নাম সত্যাগ্রহ। রবীন্দ্র-নাটকের প্রতিবাদী চরিত্র ধনঞ্জয় বৈরাগীও অহিংসামতেই লড়াইয়ে সংহত করে নিপীড়িত প্রজাদের।

ভাবছো হবে তুমিই যা চাও/জগৎটাকে তুমিই নাচাও/দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে/হয় না যেটা সেটাও হবে।

গান্ধীজি সংযমের সাধক ছিলেন। তাঁর কাছে ওটাই সংযত আত্মিক শক্তির উদ্বোধনে অতি আবশ্যকীয় রসদ। রবীন্দ্রনাথও সংযমকে অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য তিনি সৌন্দর্য-চর্চাকেও আবশ্যকীয় মনে করেছেন এবং এ দুইয়ের সমন্বয় দেখিয়েছেন।

সৌন্দর্য আমাদের প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া নিয়াছে। জগতের সঙ্গে আমাদের কেবলমাত্র প্রয়োজনের সম্বন্ধ না রাখিয়া আনন্দের সম্বন্ধ পাতাইয়াছে। প্রয়োজনের সম্বন্ধে আমাদের দৈন্য, আমাদের দাসত্ব, আনন্দের সম্বন্ধেই আমাদের মুক্তি।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী উভয়েই অত্যন্ত পীড়াদায়ক অস্পৃশ্যতার অভিশাপের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়েছেন। গান্ধী তথাকথিত সামাজিক স্তরভেদে সবচেয়ে নীচু স্থান পাওয়া মানুষদের নাম দিয়েছেন হরিজন, তাঁদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনে গেছেন বস্তিতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছেন 'সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে।'

গর্জে উঠেছেন দেশের এই অবক্ষয়ী প্রবণতার বিরুদ্ধে:

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছো অপমান/অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। বলা যায়, গান্ধীজি প্রাণ দিয়ে প্রতিবাদ রেখে যান বিভেদ বিষের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথকে চোখে দেখতে হয়নি দেশভাগ, কিন্তু বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামা মানুষটিকে চোখের সামনে দেখতে হয়েছে ২৬'র দাঙ্গা:

ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে/অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে এসে গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে কিছুদিন সস্ত্রীক বসবাস করেছিলেন। সেই স্মৃতি তিনি আজীবন বহন করেন। সশ্রদ্ধ বিনতিতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলে সম্বোধন করতেন। পুনা জেলে অনশনরত গান্ধী রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান জানান। মৌনব্রতী গান্ধী একটার পর কথা বলবেন, তাঁর ইচ্ছে রবীন্দ্রনাথ সেখানে থাকুন। শুধু থাকা নয়, অনশনভঙ্গের সময় গান শোনাতে হলো।

মহাদেব বললেন, 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা ধারায় এসো' গীতাঞ্জলীর এই গানটি মহাত্মাজির প্রিয়। সুর ভুলে গিয়েছিলেন। তখনকার মতো সুর দিয়ে গাইতে হল। (ব্রত উদ্‌যাপন)

বিভিন্ন সময় শাসকের অত্যাচার, অনাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রাঙ্গণে নেমে এসে প্রতিবাদ জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু শেষ অবধি তিনি কবিই থাকতে চেয়েছেন। এড়াতে চেয়েছেন জননেতার পোষাক।

তোমরা আজি ছুটেছো যার পাছে/সে-সব মিছে হয়েছে মোর কাছে/রত্ন খোঁজা, রাজ্য ভাঙা-গড়া /মতের লাগি দেশ-বিদেশে লড়া/আলবালে জল সেচন করা/উচ্চ শাখা স্বর্ণচাঁপার গাছে/পারিনে আর চলতে সবার পাছে।

(বিদায়: ১৪ই চৈত্র, ১৩১২)

সুভাষচন্দ্রের প্রতি কংগ্রেসের অন্যায় উদ্যোগ দেখে ব্যাথিত রবীন্দ্রনাথ পত্র লেখেন মহাত্মাকে। কামনা করেন, বাংলার আহত চিত্তে শান্তি প্রলেপণের। উত্তরে গান্ধীজি তাঁর স্বদিচ্ছার কথা জানান। পরবর্তী ইতিহাস, সে কাম্য পথে এগোয়নি, তা আমরা সবাই জানি। ভূকম্পের পেছনে সামাজিক পাপের তত্ত্বও মানতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ।

কারণ অনেক নিরপরাধ, নিষ্পাপ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে যার মধ্যে আছে শিশুরাও। যতদিন এগিয়েছে, ততই নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে মানবতা-বিরোধী শক্তির কার্যকলাপ, রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠও গণ্ডি ছাড়িয়ে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠেছে।

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস/শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস/বিদায় নেবার আগে তাই ডাক দিয়ে যাই/ দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে/প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

শান্তির বাণীর বদলে সংগ্রাম, উত্তরীয়র বদলে বর্মের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ব্যক্ত করেছেন কবিতায়।

সব মতভেদের পরেও আমাদের মনে রাখতে হবে, এই দুই মহান মানুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধার কথা। সম্প্রীতির কথা। মনে রাখতে হবে গান্ধীজির অবিসংবাদী নেতৃত্বের কথা, যাকে নন্দিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

গান্ধী মহারাজের শিষ্য/কেউ-বা ধনী কেউ-বা নিঃস্ব/এক জায়গায় আছে মোদের মিল/গরিব মেরে ভরাইনে পেট/ধনীর কাছে হইনে তো হেঁট/আতঙ্কে মুখ হয় না কভু নীল।

আমাদের সেবা নিবাস

২ পাতার পর

গেছে। তবে আরও বেশ কিছু কাজ বাকী থেকে যাবে টাকার অভাবে। এতদিন যে ভাবে সবার সাহায্য পাওয়া গেছে সেখানে এবারেও মানুষের ছোট বড় দানে সময় মতই সব কাজ শেষ হবে, টাকার অভাবে কাজ থেমে থাকবে না, এ বিশ্বাস করা যেতেই পারে। শুধু থাকবার ঘর বানালেই তো হবে না। খাট, বিছানা, ফার্নিচার্স, কাপড় কাচার মেশিন, জরুরী চিকিৎসার সরঞ্জাম, শীতের কম্বল, রান্নার বাসনপত্র - আরও কত কি! টিভি, ফ্রী কেবল কানেকশন, দুটি ফ্রীজ, ওয়াশিং মেশিন, নেবুলাইজার, কম্বল - এমন অনেক কিছুই স্থানীয় ব্যবসায়ী প্রদীপ বর্মণ, কানারা ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক, বাঙ্কশাল কোর্ট ল এ্যাসিস্টান্ট এশোসিয়েশন এবং অনেকের ব্যক্তিগত দানের মাধ্যমে। আমাদের বিধায়কের সহায়তায় প্রায় একশো কম্বল পাওয়া গেছে রোগীদের জন্য।

এবার একটি কথা বলা বোধ হয় বিশেষ প্রয়োজন। 'সেবা নিবাস' তো চিকিৎসা কেন্দ্র নয়, ক্যানসার রোগীদের থাকবার জায়গা মাত্র। এমন সব রোগী যাদের জীবন প্রায় অনিশ্চিত, যাদের জীবন-মৃত্যুর উপর একটি সংসার নির্ভরশীল, যাদের আর্থিক সঙ্গতি প্রায় শেষ, যারা নিজেদের ঘর ছেড়ে, সে ঘর যত সামান্যই হোক, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আপনজনদের ছেড়ে এখানে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। তাই শুধু থাকবার ব্যবস্থা করাই সব কিছু নয়। প্রয়োজন মানুষ হয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছা, প্রয়োজন মানসিক সাহচর্য্য, তাদের সাহস ও ভরসা যোগানো। একটু বন্ধুত্ব, একটু গল্পগুজব, একটু খবরা-খবর, একটু হাতে হাত রাখা - এই সব কিছুই মানসিক ভাবে মৃতপ্রায় ক্যানসার রোগীদের মুখে হাসি ফোটাতে ম্যজিকের মত কাজ করে। অল্পদিন আগে এক সন্ধ্যায় লেকটাউন ইনার-হুইল ক্লাবের কয়েকজন সদস্যা সেবা নিবাসের আবাসিকদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। সামান্য কথাবার্ত্তা দিয়ে শুরু হয়ে সেই গল্পের আসর চললো ঘন্টা পেরিয়ে; শেষ হল গান আর আবৃত্তি দিয়ে। আসর শেষে ঘরে ফেরার সময় রোগীদের মুখ অনাবিল অপার আনন্দে উজ্বল হয়ে উঠলো। আনন্দ পেলেন দেখা করতে আসা মহিলারাও। মাঝে সাঝে এমন ধরনের গল্প গানের আসর আয়োজন করা তো খুব কঠিন কাজ নয়। এর মাঝে আর একদিন দুপুরে নিউটাউনের টিসিএসে কর্মরত বেশ কয়েকজন তরুন তরুনী রোগীদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন হরলিকস আর ফল মিস্টি হাতে করে।

এছাড়া ১লা বৈশাখ, ১৫ই আগস্ট, দূর্গা পুজো বা অন্য বিশেষ দিনগুলোতে যখন আবাসিকদের দেখা করা হয়, ফল মিস্টি দেওয়া হয় তখন রোগীরা উজ্জিবীত হন, আনন্দ পান। অনেকেই এখন তাদের প্রিয়জনের জন্মদিন বা মৃত্যুদিনে আবাসিকদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন ফল মিস্টি হাতে করে। সুসময়ের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। সারা রাজ্য জুড়ে সুসময়ের মত অনেক ক্যানসার রোগীই কলকাতায় চিকিৎসার আশায় দিন গুনছে। শুধুমাত্র উপযুক্ত থাববার জায়গার অভাবে তাদের চিকিৎসা পিছিয়ে যাবে, এ মেনে নেওয়া খুব কঠিন।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবার

১ পাতার পর

রামলোচনের মৃত্যুর পর 'দত্তক পুত্র' দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংরেজি-পারসী ভাষায় গভীর পারদর্শিতা থাকায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে মেলামেশা এবং ব্যবসা সংক্রান্ত নানাবিধ কাজকর্মে যুক্ত হয়ে পড়লেন। নীল ক্রয়ে ম্যাকিন্টসদের সহযোগী হলেন এবং তার ফলে বিলেত থেকে সরাসরি ব্যবসায় অর্ডার পেতে শুরু, যাতে প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দ্বারকানাথ শিলাইদহ সহ অন্যান্য স্থানে নীলকুঠী কিনেছিলেন। রামনগরে চিনির কারখানা করেন, রানীগঞ্জে কয়লাখনি করেন এবং ক্রমে ক্রমে উত্তরবঙ্গে প্রচুর জমি কেনেন এবং জমিদার হিসাবে খ্যাত হয়ে পড়েন। তিনি এরই মধ্যে অনেক জনহিতকর কাজও করেছিলেন -- হিন্দু কলেজ, মেডিকেল কলেজ, জমিদারী সভা, ডাক বিনিময় সংক্রান্ত বিধি ব্যবস্থা, সতীদাহ প্রথার নিবারণ, সমাজসংস্কারমূলক বিভিন্ন কাজে অনেকেরই আগে তিনি এগিয়ে যেতেন। ১৮৪২ সাল এবং ১৮৪৪ সালে বিলেতে যান। ফিরে এসে আপন আত্মীয়পরিজনদের ছেড়ে আচার আচরণে একটা বিলেতি ভাব মিশিয়ে ফেলায় তৎকালীন সমাজে তিনি 'প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর' এই অভিধায় ভূষিত হয়ে যান।

প্রিন্স দ্বারকানাথের বড় ছেলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মা দিগম্বরী দেবী। দ্বারকানাথের পাঁচ পুত্রের মধ্যে প্রথম পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ছাড়া সকলেই অপ্রাপ্ত বয়সেই মারা যান। দেবেন্দ্রনাথের বারো বছর বয়সে খুলনার দক্ষিণডিহির রায়চৌধুরি রামনারায়ণের কন্যা সারদা দেবীর সহিত বিবাহ হয় যখন তখন সারদাদেবীর বয়স ছিল ছয় কি সাত বছর। সারদাদেবী ১৫টি সন্তানের জননী হন -- রবীন্দ্রনাথের তিনিই গর্ভধারিণী।

দেবেন্দ্রনাথ ও সারদাদেবীর যথাক্রমে সন্তানরা হলেন -- প্রথম কন্যা সন্তান, যিনি অকালে প্রয়াত হন। তারপর বাকি সন্তানদের মধ্যে পুত্র সন্তান ৯ জন -- দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, পূর্ণেন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ এবং অষ্টমগর্ভে রবীন্দ্রনাথ, পরে বুধেন্দ্রনাথ। আর কন্যারা যথাক্রমে: সৌদামিনী, সুকুমারী, শরৎকুমারী, স্বর্ণকুমারী ও বর্ণকুমারী। বাংলার নব-জাগরণের নানা উপঢৌকন দেবেন্দ্রনাথের পুত্র-কন্যাদের দ্বারাই সুশোভিত কাল-অতিক্রান্ত সম্পদে বিভূষিত। কাব্য-দর্শন-সঙ্গীত-গণিত-সংস্কৃত এবং সাহিত্য-আকাশ পরিব্যপ্ত অভাবনীয় প্রতিভার আভায় উজ্জ্বল। আর রবীন্দ্রনাথ! আজ গোটা পৃথিবীর সকল প্রকার শুভ কর্মপ্রবর্তনায় সাহিত্য সাধনা-ধর্মালোচনা-রাজনৈতিক চিন্তা ও চেতনার দীপ্তিতে অনন্যতায় রবীন্দ্রনাথ বর্ধিত-শোধিত-উৎসারিত।

সেবক
৩০ বৈশাখ ১৪২২ ● বৃহস্পতিবার ১৪ মে ২০১৫

সেবকের কথা

প্রতি সংখ্যা প্রকাশের আগেই হয়ে থাকে একটি গম্ভীর আলোচনা। এবারও তাই। মাসটা মে-মাস। মানে রবীন্দ্র-মাস। সম্পাদকমণ্ডলীর সকলেই এক বাক্যে সিদ্ধান্তে উপনীত -- সংখ্যাটা হবে রবীন্দ্র-সংখ্যা। ব্যাস্। সীমায় অপরিসীম, মহাকাশের নক্ষত্ররাজি ঢেকে যেতে পারে, এমনই এক মানুষের পরিসরকে ঘিরে এবারের পত্রিকা। সেবক। রবীন্দ্র-সংখ্যা। তাই -- ...মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, 'প্রতিদিন' কেন পাই না? কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না? ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে তোমায় যবে পাই দেখিতে, হারাই-হারাই সদা ভয় হয়, হারাইয়া 'ফেলিব না' চকিতে।।... 'রাজা রানী' নাটকের পংক্তি থেকে -- এ রাজ্যেতে যত সৈন্য, যত দূর্গ, যত কারাগার, যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ়বলে ক্ষুদ্র 'এক পত্রিকা সেবক'কে?... পারে, পারব।...একবার দেখে যাও, দেখে যাও। কত দুখে যাঁপি দিবানিশি, তোমা বিহনে, 'সেবক-প্রতিবেশী'। তোমা বিনে তপন আভাহীন, উদাস মলয়, তোমা 'সহযোগে' এ 'সেবক' আলোকময়। তুমি আসো। তোমরা আসো। সেবক-এর সেবায় সহযোগী হও।

সম্পাদক সমীপেষু

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু,
আমি, চন্দন। পাড়ার অনেকের চন্দনদা। শ্রীভূমিতে দীর্ঘদিন সব্জির ব্যবসা করি। এবং এ ক্ষেত্রে দাবি রাখতে পারি, আমার পসরায় সাজানো সব্জি, বাজারে একটু আলাদাই হয়। আসলে পাড়ার সকলের কাছে 'দাম'-ই তো শেষ কথা! কিন্তু আমি কখনওই আমার আনা 'সব্জি'র সঙ্গে 'ভাইবন্ধী' করতে রাজি নই। নিলে নেবেন, না হলে থাক্। জানতে পারলাম, এতদ অঞ্চলে প্রকাশিত একটিই মাত্র পত্রিকা 'সেবক' জন-মানুষের মতামত চায়। এক্ষেত্রে প্রথমেই বলি, আমি প্রথম দিন থেকেই এই পত্রিকা হাতে পেয়েছি এবং বিশদে পড়েছি। বিশেষ করে, আমার পছন্দের মানুষদের লেখা। নাম উল্লেখ করলাম না। এই পত্রিকা সম্বন্ধে আমার অনেক কথা বলার আছে। থাকবেও। শুনেছি এই চিঠিপত্রের কলামটা নিতান্তই ছোট্ট! যদিও এই পত্রিকার আধিকারিকদের দৃষ্টি আকর্ষণে আমার অনেক কিছুই বলার ছিল, বলতে না পেরে, অনুরোধ করব আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার। সময়, সুযোগ হলে। পরিশেষে এটুকু বলি, পত্রিকাটা এখনই 'মাসিক' হওয়া উচিত। কারণ, দ্বিমাসিক হওয়াতে পড়তে পড়তে ধারাবাহিকতা রাখতে পারছি না।
ধন্যবাদান্তে,
চন্দন, চন্দ্রকুমার বিশ্বাস। শ্রীভূমি

সম্পাদক সমীপেষু,
মহাশয়/মহাশয়া,
আমি বাপী। মানস তালুকদার। প্রান্তিক আমার দোকান। অনেকদিন ধরেই দেখছি আমাদের পাড়া থেকে একটি রঙিন, বেশ ঝক্‌ঝকে একটি দ্বিমাসিক পত্রিকা বেরুচ্ছে। ভাল। এমন কিছু লেখা থাকুক যা আমার, আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। বলতে চাই সংগ্রহে রাখতে পারি। উদ্যোক্তাদের কাছে অনুরোধ, লেখার মান এমনটা হোক, যাতে আমাদের সংগ্রহে এই পত্রিকাটিও 'একটা' হয়ে ওঠে। — মানস তালুকদার।

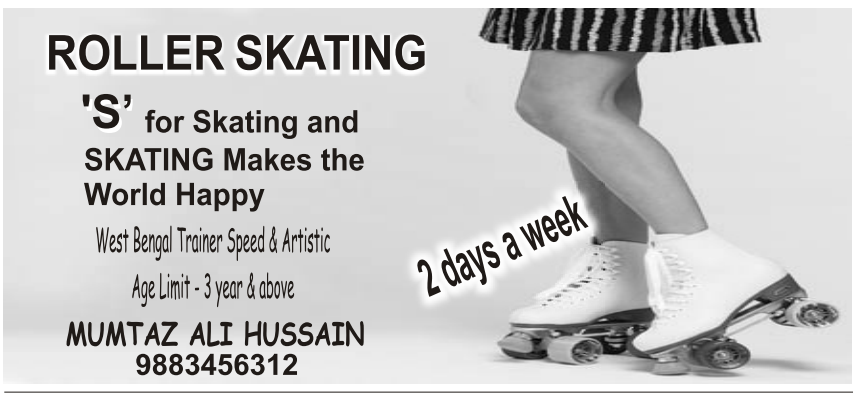

রবীন্দ্রনাথ ও ব্যাঙ্কিং

শঙ্করলাল ঘোষাল

আমাদের দেশের 'প্রাণ' বলতে আজও সেই প্রত্যন্ত গ্রাম-নির্ভরতা। তার অন্যতম প্রধান কারণ, গ্রামীণ মানুষের সরলতা, একে অপরের সঙ্গে নিবিড় মেলামেশা এবং আত্মিক গ্রাম-নির্ভর সামাজিক সম্পর্ক যতটা খোলামেলা, যতটা স্বাভাবিক, সহজলভ্য তা আজও শহর, আধা-শহরের ক্ষেত্রে হয়ে ওঠেনি। শহুরে জটিলতা নিয়তই বিদ্যমান। এই উপলব্ধি আজ থেকে প্রায় এক শতাব্দীরও আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর করেছিলেন। উদ্বিগ্ন ছিলেন, দেশের অর্থনৈতিক মূলধন একপেশে ভাবে কেন্দ্রীভূত হতে থাকা এক বিশেষ শ্রেণীর হাতে চলে যাওয়া নিয়ে। অপরদিকে গ্রামীণ অর্থনীতির মূল-কাঠামোয় ধ্বংসের আগাম চিন্তায় তিনি ছিলেন গভীর চিন্তিত। সমবায় নীতি বা কো-অপারেটিভ প্রিন্সিপলের কথা তিনি আগেই অনুভব করেছিলেন। গোটা পৃথিবীতেই অর্থনীতির নির্ণায়ক এবং পরিচালক এক সংখ্যাল্প সম্প্রদায়েরই একচেটিয়া। যাঁরা এই ক্ষমতা অর্জন করেছেন মূলত গ্রামীণ কৃষক-শ্রমিকের উৎপাদনের মূল মুনাফা নিজেদের কুক্ষিগত করে। শ্রমিক-কৃষক নির্বিশেষে এই শোষণের নিষ্পেষণে ক্রমাগতই গরিব থেকে গরিবই থেকে গিয়েছে। আর অন্যদিকে শোষক সামাজিক, পারিপার্শ্বিক এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক ক্ষমতার একচেটিয়া অধিকার বিস্তার করে সমাজের ভারসাম্যে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে।

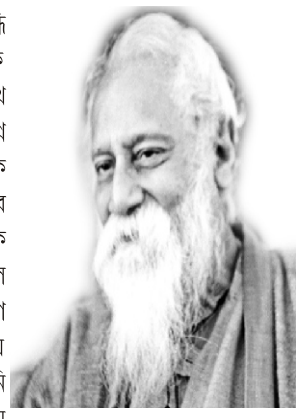

এই উপলব্ধি থেকেই রবীন্দ্রনাথ সমবায়-নীতি বা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কিংয়ের কথা মাথায় নিয়েছিলেন। ১৯১৫ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যে যে সকল প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, তাতে তিনি সুস্পষ্টভাবে এই উপলব্ধির কথাই বলেছিলেন, সেখানে বারে বারে ঘোষিত হয়েছে শোষিত গ্রামীণ শ্রমজীবী-কৃষিজীবী মানুষের সম্মিলিত অর্থনীতির কথা। তাঁর চিন্তার মর্মস্থলে নিহিত ছিল সমবায়নীতি। ''অবহেলিত গ্রামগুলি-১৯৩৪'' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন আজ পল্লী আমাদের আধমরা, যদি এমন কল্পনা করে আশ্বাস পাই যে, অন্তত আমরা আছি পুরো বেঁচে, তবে ভুল হবে। কেননা মুমূর্ষের সঙ্গে সজীবের সহযোগ আসলে মৃত্যুর দিকেই টানে। বিশিষ্টজনেরা এর যে সমাধানের প্রস্তাব করেছিলেন, যেমন পরোপকার বা ধনবান ব্যক্তিদের নৈতিক, চারিত্রিক আলোক-প্রাপ্তিতা, প্রকারান্তরে হতে পারে গরিবের উন্নয়ন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই এতে অত্যন্ত সন্দেহ প্রবণ ছিলেন। তাই তিনি লিখেছিলেন, এ যেন মৃদু আঘাতের মাধ্যমে একটা দুর্বার আবেগের ফুৎকারে সমাপ্তি।

বস্তুতপক্ষে তিনি চেয়েছিলেন, সঠিক উৎপাদনের একটি রাষ্ট্র-নীতি। আসলে তিনি তো শুধুই কবি নন, তাঁর দার্শনিক মননশীলতা, সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গেই নিজের জীবন বোধের উপলব্ধিও গুরুত্বসহকারেই বুঝেছিলেন। তাঁর ব্যাখ্যাও রেখেছিলেন তৎকালীন সমাজে। যা কিনা বর্তমান সমাজেও অতীব জনপ্রিয় দর্শন। তিনি চেয়েছিলেন, সঠিক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সেই সংস্থান (যা হল জমি এবং মূলধন)। সম্মিলিতভাবে যার মালিক হবে শ্রমিক-কৃষক নির্বেশেষে 'উৎপাদক' নিজেরাই। তাঁদের নিশ্চিত করবে উৎপাদিত পণ্যের অধিকার, তাঁদের ভাগাংশের মূল্য এবং শ্রমের মূল্যের সঠিক নির্ণায়ক হতে। এই দর্শনেই আস্থা রেখে কৃষকদের দুর্দশা লাঘব করার জন্য তিনি ১৯০৫ সালে পাতিসরে এবং পরে শিলাইদহে কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করেছিলেন।

১৯১৩ সালে তাঁর নোবেল পুরস্কারের সমস্ত টাকা ১ লক্ষ ৮ হাজার ওই কৃষি-ব্যাঙ্কে তিনি জমা রাখেন। এবং ধীরে ধীরে কৃষকদের কল্যাণে সেই অর্থ উৎসর্গ করেন। তথ্য বলছে, ১৩২০ থেকে ১৩৪৫ সাল পর্যন্ত ওই শিলাইদহ এস্টেটের ব্যাঙ্কের লেনদেন (২৫ বছরেরও বেশি) নিয়মিত সম্পাদিত হত।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচেতনা ও অবদান

হিরণ্ময় সাহা

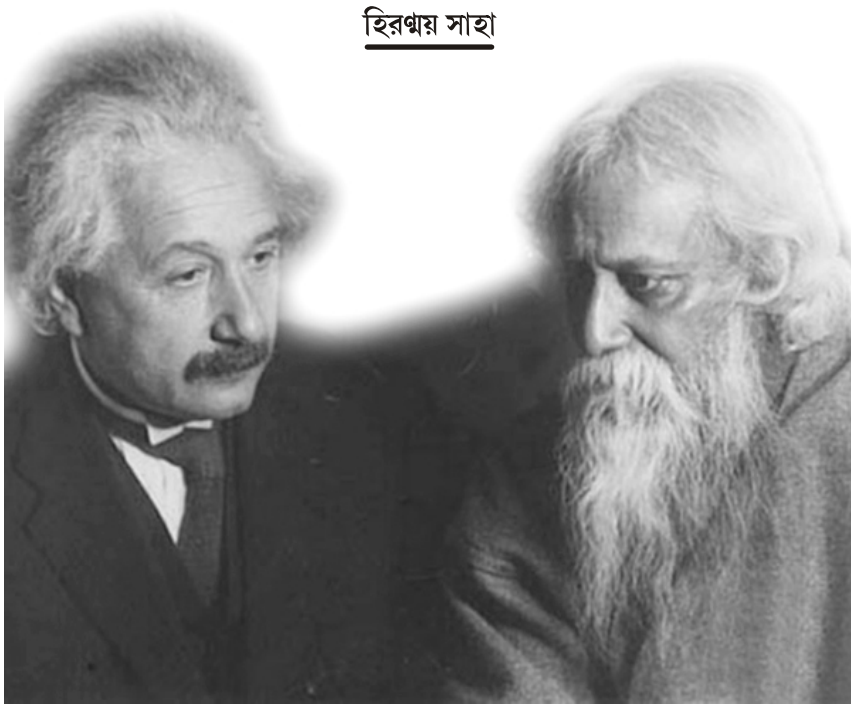

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মের ১৫৪ বছর পরেও যতদিন যাচ্ছে ততই আমরা যেন তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার বিশাল ব্যাপ্তি এবং অতলান্ত গভীরতায় অবাক হয়ে যাই। সাহিত্যজগতের সর্বদিকে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর গান ও সুরে আমরা সবাই সর্বক্ষণ আপ্লুত হয়ে আছি। তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও দৃষ্টান্তমূলক ও সর্বাধুনিক। হস্তশিল্প, গ্রামোন্নয়ন, সমবায় ব্যাঙ্কিং ইত্যাদি নানারকমের সমাজকল্যাণমূলক কাজকর্মে ও চিন্তা ভাবনায় তাঁর অবদান মৌলিক ও পথিকৃৎ। এ সবই সম্ভব হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির এক অপূর্ব সমন্বয়ে। আর এই অন্তর্দৃষ্টির মূলে রয়েছে তাঁর অসাধারণ বিজ্ঞানমনস্কতা -- পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও উপলব্ধির অসীম ক্ষমতা।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরি হয়েছিল তাঁর একেবারে ছোটবেলা থেকেই। যে পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তা ছিল তৎকালীন হিন্দুসমাজের পরিপ্রেক্ষিতে অনুশাসনহীন, সংস্কারমুক্ত আচার-প্রথার ভারমুক্ত এক ব্রাহ্ম পরিবার। ছোটবেলায় অনেকটা সময় তাঁকে একা একা কাটাতে হতো। ঘরের এক কোণে গণ্ডির মধ্যে বসে থাকা শিশু রবীন্দ্রনাথ জানালা দিয়ে ঠাকুরবাড়ির বিশাল বাগানের গাছপালা, পাখি, পুকুর ও স্নানরত লোকজনের বিশেষ স্নানভঙ্গিমা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও উপভোগ করতেন।

ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে এক অনাবিল অনুসন্ধিৎসা কাজ করত। তাঁর নিজের কথায় শোনা যাক -- ''তখনকার দিনে (রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলা) এই পৃথিবী বস্তুটার রস কী নিবিড় ছিল সেই কথাই মনে পড়ে। কী মাটি, কী জল, কী গাছপালা, কী আকাশ -- সমস্তই তখন কথা কহিত মনকে কোনমতেই উদাসীন থাকতে দেয় নাই। পৃথিবীকে কেবলমাত্র উপরের তলাতেই দেখিতেছি, তাহার ভিতরের তলাটা দেখিতে পাইতেছি না। ইহাতে কতদিন যে মনকে ধাক্কা দিয়েছে তা বলিতে পারি না।'' (জীবনস্মৃতি-পৃ ১০)।

বাল্যশিক্ষার শুরু থেকেই রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানশিক্ষা শুরু হয়েছিল। তার কথায় -- ''প্রায় মাঝে মাঝে সীতানাথ দত্ত মহাশয় আসিয়া যন্ত্রতন্ত্র যোগে প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। এই শিক্ষাটি আমার কাছে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক ছিল। জ্বাল দিবার সময় তাপসংযোগে পাত্রের নিচের জল পাতলা হইয়া উপরে উঠে, উপরের ভারী জল নীচে নামিতে থাকে এবং এই জন্যেই জল টগ্‌বগ করে -- ইহাই যেদিন তিনি কাচপাত্রে জলে কাঠের গুঁড়া দিয়া আগুনে চড়াইয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন সেদিন মনের মধ্যে যে কিরূপ বিস্ময় অনুভব করিয়াছিলাম তাহা আজও স্পষ্ট মনে আছে। দুধের মধ্যে জল জিনিসটা যে একটা স্বতন্ত্র বস্তু, জ্বাল দিলে সেটা বাষ্প-আকারে মুক্তিলাভ করে বলেই দুধ গাঢ় হয়, এ কথাটাও যেদিন স্পষ্ট বুঝিলাম, সেদিনও ভারি আনন্দ হইয়াছিল। যে রবিবার সকালে তিনি না আসিতেন, সে রবিবার আমার কাছে রবিবার বলিয়াই মনে হইত না।'' (জীবনস্মৃতি-পৃ ১৬)। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির এই বর্ণনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায় তার মানসিকতায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি কী গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। দুঃখের বিষয়, আজকালের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থায় এই হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের পদ্ধতির প্রচলন নেই।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানমনস্কতা সম্পর্কে বিশিষ্ট অধ্যাপক ও গবেষক ক্ষুদিরাম বসু তাঁর ''রবীন্দ্র কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার'' বইয়ের ভূমিকায় বলেছেন -- 'রবীন্দ্রসাহিত্য পড়তে পড়াতে এবং লিখে আলোচনা করতে প্রখর কাব্যবুদ্ধি ছাড়া অন্য যে কটি বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করতে হয় তা হল রাগরাগিণীসহ সঙ্গীত, স্বাদেশিক সমাজ-ইতিহাস এবং আধুনিক বিজ্ঞান। নভো-বিজ্ঞান পরিচিতি ছাড়া কবির শেষার্ধের বহু কবিতার আধা-পরিচয় থেকেই তৃপ্ত থাকতে হয়। ... শেষের দিকে লেখা পূরবী, বনবাণী, শেষসপ্তক, সানাই, নবজাতক, প্রান্তিক প্রভৃতি কাব্য তো সূর্য-তারকা-নীহারিকা পরিবৃত মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংসের আলোড়নে কম্পনে বিকিরণ বিচ্ছুরণেই স্পন্দিত।

ভাবতে খুব মজা লাগে যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম গদ্যরচনা শুরু করেন বিজ্ঞান-রচনা দিয়ে -- ''গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি'' নামে একটি রচনা তিনি মাত্র সাড়ে বারো বছর হয়সে ''তত্ত্ববোধিনী'' পত্রিকায় লেখেন। তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক পরের লেখা বেরোয় প্রায় চার বছর বাদে -- ''সামুদ্রিক জীব'' নামে। লেখাটি অনেক পরিণত ও তথ্যসমৃদ্ধ। ডারউইনের বিবর্তনবাদ ভাল করে বোঝার আগেই তাঁর স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিশ্লেষণ থেকে লেখা মন্তব্যটি -- ''কোনখানে উদ্ভিদ-শ্রেণী শেষ হইল ও জীব-শ্রেণীর আরম্ভ হইল তাহা ঠিক নিরুপণ করা অতিশয় কঠিন।'' ''নিস্ফল আত্মা'' (১৮৮৫) প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, ''জড় হইতে মনুষ্য-আত্মার অভিব্যক্তির মধ্যে কত কোটি কোটি বৎসরের ব্যবধান।'' তাঁর বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার স্বচ্ছতার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথের আর একটি লেখা ''ভূতের গল্পের প্রামাণিকতা''য় তিনি অলৌকিকতার বিরুদ্ধতা করেছেন। জীবনের শেষভাগে প্রায় ৭৬ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একমাত্র পুরোপুরি বিজ্ঞানভিত্তিক রচনা ''বিশ্ব পরিচয়' রচনা করে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উৎসর্গ করেছিলেন। বিজ্ঞান ও সাহিত্য উভয়ের বিচারেই রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' একটি অসামান্য রচনা।

রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে -- তাঁর রচিত অসংখ্য কবিতা, গানে, গল্পে, প্রবন্ধে যখনই কোনও ফুল-ফল, গাছ, পাতা ফসল বা প্রকৃতির কোনও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা সব সময়েই বাস্তবসম্মত ও প্রকৃতিগ্রাহ্য। চারিদিকের প্রকৃতিকে তিনি যে কত নিবিড়ভাবে অবলোকন ও অনুভব করতেন এটা তারই পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-চেতনার সবচেয়ে বড় সুফল হচ্ছে, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের এক অপূর্ব সমন্বয়। তাঁর অসাধারণ সাহিত্যিক ও দার্শনিক সত্তা বিজ্ঞানের রসে সিঞ্চিত হয়ে যে অপূর্ব সাহিত্যসম্ভার সৃষ্টি করেছেন -- সমগ্র বিশ্বে তার তুলনা মেলা ভার। ''বাউলের গান'' প্রবন্ধে বিজ্ঞান থেকে উপমা নিয়ে তিনি লিখেছেন -- ''উত্তাপ যদি সর্বত্র একাকার হইয়া যায় তাহা হইলে হাওয়া খেলায় না, নদী বহে না, প্রাণ টেঁকে না, একাকার হইয়া যাওয়ার অর্থই পঞ্চত্ব পাওয়া।... প্রেমের তারের মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তড়িৎ খেলাইতে থাক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর নিমেষের মধ্যে প্রাণের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হয়।''

রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক সত্য উপলব্ধির সঙ্গে তাঁর কল্পনার সৌন্দর্য যুক্ত হয়ে যে অনন্যসাধারণ সৃষ্টি হয়েছে তার আরেকটি দৃষ্টান্ত: (ভাষা ও ছন্দ, ১৮৯৯)।

''নক্ষত্রের অক্ষৌহিণী হতে অরণ্যের পতঙ্গ অবধি মিলাইছে এক স্রোতে সঙ্গীতের তরঙ্গিণী বৈকুণ্ঠের শান্তিসিন্ধুপারে।''

অ্যাস্ট্রনমি ও এন্টমোলজি -- জ্যোতির্বিজ্ঞান ও কীটতত্ত্ব -- দুইয়ের জ্ঞানই এই কটি ছত্রের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে।

আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাক কবিতার ছন্দে -- (সন্ধ্যাসঙ্গীত, অনুগ্রহ, ১৮৮২)--

''ভিক্ষাবৃত্তি করে না তপন/পৃথিবীরে চাহে সে যখন;/সে চাহে উজ্জ্বল করিবারে/সে চাহে উর্বর করিবারে/জীবন করিতে প্রবাহিত/কুসুম করিতে বিকশিত।''

এই কয়েকটি ছত্রের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি ও প্রাণপ্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য সূর্যের যে ভূমিকা তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সবুজ গাছের পাতায় সূর্যালোকে ফোটোসিনথেসিসের মাধ্যমে বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও গাছের জলের সাহায্যে আপন দেহের পরিপুষ্টির জন্য কার্বোহাইড্রেট তৈরি হয় এবং প্রয়োজনীয় অক্সিজেন বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবেই সূর্যালোক পৃথিবীকে উর্বর করে, জীবন প্রবাহ অব্যাহত রাখে।

রবীন্দ্রনাথের আরেকটি রচনার অংশ পড়া যাক -- 'ইথর কাঁপিতেছে, আমি দেখিতেছি আলো। বাতাসে তরঙ্গ উঠিতেছে, আমি শুনিতেছি শব্দ, ব্যবচ্ছেদ-বিশিষ্ট অতি সূক্ষ্মতম পরমাণুর মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণ চলিতেছে, আমি দেখিতেছি বৃহৎ দৃঢ় ব্যবচ্ছেদহীন বস্তু।'' (ডুব দেওয়া, জগৎ মিথ্যা, ১৮৮৪)।

১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ 'নটরাজ' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় পরমাণুর বিদ্রোহী শক্তিকে বর্ণনা করেছেন--

''নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু''।

আরেকটি উদাহরণ না দিয়ে পারছি না -- (পাগল, ১৯০৪) -- ''এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা কিছু অভাবনীয় তাহা খামোখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। তিনি কেন্দ্রাতিগ, 'সন্ট্রিফ্যুগাল' -- এই পাগল আপনার খেয়ালে সরীসৃপের বংশে পাখি এবং বানরের বংশে মানুষ উদ্ভাবিত করেছেন।'' অথবা -- ''বাতাসে চলনশীল জ্বলনধর্মী অক্সিজেনের পরিমাণ অল্প, স্থিরশান্ত নাইট্রোজেনই অনেক। যদি তাহার উল্টা হয়, তবে পৃথিবী জ্বলিয়া ছাই হয়।'' (পনেরো আনা, ১৯০২)। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের অজস্র রচনায় বৈজ্ঞানিক সত্য ও ঘটনা সুন্দর সাহিত্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে। যার আর কোনও তুলনা নেই। সাধারণ মানুষের কাছে বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত করার জন্য যে অনুপম রচনাশৈলীর প্রয়োজন তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ কবিগুরু, সঙ্গীতগুরু, শিক্ষাগুরু, কর্মগুরু -- হয়তো বিজ্ঞানগুরু নন। প্রথাগত বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণা রবীন্দ্রনাথ করেননি -- কিন্তু তাঁর অন্তর্নিহিত সত্যের আলোকে বিজ্ঞানের দুরূহ রহস্য তাঁর কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তাঁর কাব্যচেতনা ও দর্শনচেতনার সঙ্গে বিজ্ঞান চেতনা সম্পৃক্ত হয়ে এক অনন্যসাধারণ সৃষ্টিসম্ভার তৈরি হয়েছে -- যার সঠিক মূল্যায়ন ও চর্চা এখনও বাকি আছে।

তথ্যসূত্র: ১) জীবনস্মৃতি -- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -- বিজ্ঞান রচনা সংকলন -- শ্যামল চক্রবর্তী। ৩) রবীন্দ্রায়ণ-২য় খণ্ড -- (সম্পাদনা: পুলিনবিহারী সেন) রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান --পরিমল গোস্বামী।

রবীন্দ্র-গানে আধ্যাত্মিক চেতনার প্রকাশ

সাগরিকা বিশ্বাস

"আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে। এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে।।" — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম যে পরিবারে -- জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার, অনেক সম্পদের মধ্যে তা ছিল আধ্যাত্মিক সম্পদেও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বিশেষতঃ কবির পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চেতনা ছিল সদা জাগ্রত। পুত্র রবির মধ্যে সেই বীজটি বপন করার প্রচেষ্টা আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করি যখন উপনয়নের পরে ১১ বছরের বালক রবি, তাঁর পিতার সঙ্গে হিমালয়ে গিয়ে বেশ কিছুটা সময় কাটালেন। আলো-না-ফোটা শীতের ভোরে, উষ্ণ কম্বলের তলা থেকে আধোজাগরণে রবি দেখতেন, তাঁর পিতা বারান্দার এক কোণে বসে গভীর ধ্যানে মগ্ন। দেবেন্দ্রনাথের প্রার্থনা চলত সূর্য ওঠার মুহূর্ত অবধি। প্রার্থনা শেষ হবার আগে পুত্রকে ডেকে পাশে নিয়ে দ্বৈত কণ্ঠে উপনিষদের শ্লোক উচ্চারণের মধ্যে, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনা আরো দৃঢ় করে তুলতেন। এই ভাবেই চলেছিল রবির বড় হয়ে ওঠা।

রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্য্যায়ের গানগুলি যদি আমরা গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করি, গাই এবং উপলব্ধি করার চেষ্টা করি, তাহলে আমাদের চিত্তেও আধ্যাত্মিক বোধের উন্মেষ ঘটে। ঈশ্বরকে তিনি যে কত বিচিত্র নামে সম্বোধন করেছেন, তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। গানের মধ্যে তাঁর সে সম্বোধনের উদাহরণ হল: প্রিয়তম, প্রাণেশ্বর, জীবনস্বামী, অন্তরতর, ত্রিভুবনেশ্বর, রাজরাজ, প্রেমময়, ধ্রুবজ্যোতি, চিরসঙ্গী, করুণাময়, অন্তর্যামী, হৃদীশ্বর, বিশ্বরাজ, বিশ্বনাথ, জীবনবল্লভ, প্রাণাধীশ, জগপতি , প্রভাতজ্যোতি, হৃদয়হরণ, জীবননাথ, জীবনবিধাতা, জ্যোতির্ময়, রাজরাজেন্দ্র, মহারাজা, দরদিয়া, প্রাণসখা, রাজা, পিতা, সখা, পথের সাথী, পান্থ, প্রিয়, বন্ধু, প্রভু, প্রেমিক, পথী, সারথি, নাথ, প্রভৃতি।

গুরুদেব তাঁর জীবনদেবতাকে একক, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যে দেখেছেন পরম এক রাজরাজেন্দ্র বেশে। তিনি উচ্চকণ্ঠে জয়গান গেয়েছেন ঈশ্বররূপী জ্যোতির্ময়ের, যিনি দ্বার ভেঙ্গে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা যখন কবির লেখনিতে পাই করুণাময়ের কাছে তাঁর একান্ত প্রার্থনা -- 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে/সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।' তখন মনে হয় এর থেকে আন্তরিক প্রার্থনা আর কি হতে পারে। তিনি আরও চেয়েছেন তাঁর মহারাজার রূপহীন যে বাণী, তার মধ্যে দিয়েই যেন তাঁর অঙ্গ ও চিত্ত লাভ করে মুক্তির আশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা তখনি এক উচ্চ স্তরের আধ্যাত্মিক বোধের পরিচয় পাই যখন দেখি তিনি, জগত জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান শুনতে পেয়েছেন, আর প্রতীক্ষা করে আছেন কবে সেই গান গভীর ভাবে তাঁর হিয়ায় বাজবে।

প্রাণসখার কাছে প্রার্থনায় কবির করুণ আকূতির প্রকাশ ঘটে যখন তিনি লেখেন, 'চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে, নিয়ো না, নিয়ো না সরায়ে, --/জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে বক্ষে ধরিব জড়ায়ে।।' বা যখন লিখলেন 'অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে।' আবার লিখলেন 'হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই/ সংসারে যা দিবে মানিব তাই,/ হৃদয় তোমায় যেন পাই।' তাঁর একান্ত প্রার্থনা নিবেদিত হল আধ্যাত্মিক চেতনায় পরিপূর্ণ অসাধারণ সব সঙ্গীত সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে--'হে সখা মম হৃদয়ে রহো/ সংসারে সব কাজে ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহো।' বা 'চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না। / সংসার গহনে নির্ভয় নির্ভর, নির্জন সজনে সঙ্গে রহো।' অথবা 'বিপদে সম্পদে থেকো না দূরে, সতত বিরাজো হৃদয়পুরে'। তিনি আরো প্রার্থনা করেছেন তাঁর জগপতির সৃষ্টি রাতের তারা, দিনের রবি আর আকাশভরা সকল বাণী নিয়ে তিনি যেন কবির হৃদয়মাঝে একটি সুন্দর আসন বিছিয়ে দেন। আকুল আকুতি নিয়ে লিখলেন'প্রভু আমার প্রিয় আমার পরমধন হে/ চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে।' তারি সঙ্গে কামনা করলেন তাঁর প্রাণাধীশের আশীর্বাদ যা তিনি এখানে সুর বলে ব্যাখ্যা করেছেন যেন শ্রাবণের ধারার মত তাঁর ওপরে ঝরে পড়ে। আরো বললেন সেই আশীর্বাদ যেন 'পুরবের আলোর সাথে পড়ুক প্রাতে দুই নয়নে/ নিশীথের অন্ধকারে গভীর ধারে পরুক প্রাণে।'

জীবনদেবতার সাথে রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছিলেন এক মধুর সম্পর্ক। সেই সম্পর্কের সূত্রেই তিনি লিখেছেন, 'তোমায় নতুন করে পাব ব'লে হারাই ক্ষণেক্ষণ ও মোর ভালোবাসার ধন/দেখা দেবে বলে তুমি হও যে অদর্শন ও মোর ভালোবাসার ধন।' অথবা 'জীবন জুড়ে লাগুক পরশ, ভুবন ব্যেপে জাগুক হরষ,/তোমার

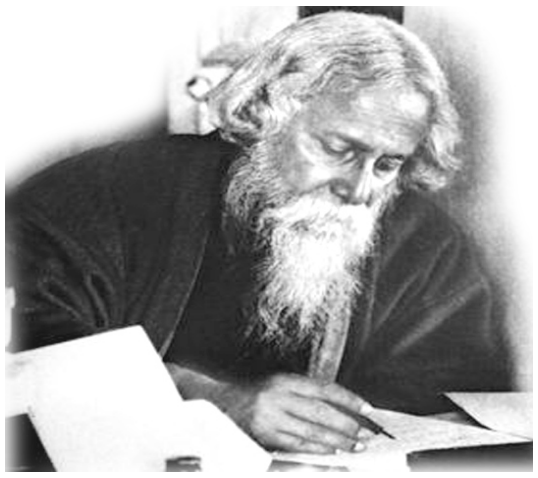

রূপে মরুক ডুবে আমার দুটি আঁখিতারা।।' কখনো বললেন, 'তুমি বন্ধু তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার।' শুধুমাত্র মধুর নয়, তার হৃদীশ্বরের সঙ্গে কবি গড়ে তুলেছেন এক অত্যন্ত ইতিবাচক সম্পর্ক। তারি সূত্রে তিনি বলে ওঠেন, 'তোমায় আমায় মিলন হবে বলে আলোয় আকাশ ভরা/ তোমায় আমায় মিলন হবে বলে ফুল্ল শ্যামল ধরা।' আবার কোথাও বললেন, 'তুমি এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে কী উৎসবের লগনে/ সব আলোটি কেমন করে, ফেল আমার মুখের পরে, তুমি আপনি থাকো আলোর পিছনে।'

গভীর আধ্যাত্মিক বোধ থেকে পরমবন্ধুকে গুরুদেব বলেন, 'শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়, মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশ খানি দিয়ো।।' আবার কোথাও প্রিয়তম কে বলেন, 'মিলাব নয়ন তব নয়নের সাথে, মিলাব এ হাত তব দক্ষিণ হাতে প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।' ঈশ্বর উপলব্ধির শিখরে বসে তিনি লিখেছেন, 'আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টি খানি/ রচিয়া তুলেছে বিচিত্র তব বাণী' বা 'তোমার প্রেমে ধন্য কর যারে সত্য করে পায় সে আপনারে।।/ দুঃখ শোকে নিন্দা-পরিবাদে/ চিত্ত তার ডোবে না অবসাদে,/ টুটে না বল সংসারের ভারে।।' বিশ্বরাজের প্রেমে ধন্য হওয়া হৃদয় নিয়ে পরম নির্ভরতায় কবি লিখলেন, 'অনন্ত এ দেশকালে, অগণ্য এ দীপ্তলোকে/তুমি আছ মোরে চাহি, আমি চাহি তোমা পানে।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগীত প্রীতির মধ্যে হৃদয়দেবতার উপস্থিতি খুবি প্রকট। তিনি কামনা করেছেন তাঁর আরাধ্য দেবতার জগতসভায় যেন একটু স্থান পান, কারণ সেই প্রাণের দেবতার গান গাইবার উদ্দেশ্যে তিনি এই ধরায় বিচরণ করছেন। কবি তাঁর ধ্রুবজ্যোতিকে লাভ করার আনন্দ প্রকাশ করেছেন অপূর্ব সুন্দর ভাষায়'তোমারি ওই অমৃতপরশে আমার হিয়াখানি/ হারালো সীমা বিপুল হরষে, উথলি উঠে বাণী।' কখনো সে আনন্দ প্রকাশ করলেন অনবদ্য ভাষায়'দিকে দিগন্তে যত আনন্দ লভিয়াছে এক গভীর গন্ধ,/ আমার চিত্তে মিলি একত্রে তোমার মন্দিরে উচ্ছ্বাসে'। গুরুদেবের বহু রচনায়, গানে কবিতায় আমরা দেখতে পাই তিনি বলেছেন, ভক্ত যে শুধু ভগবান কে খুঁজে বেড়ায়, তা নয়। ভগবানও আসেন ভক্তের দ্বারে প্রেম ভালোবাসা কুড়োতে। তিনি লিখলেন, 'আমায় তুমি করবে দাতা, আপনি ভিক্ষু হবে/ বিশ্বভুবন মাতল যে তাই হাসির কলরবে।' কবি বলেছেন ভক্ত ছাড়া ভগবান অসম্পূর্ণ। তাই লিখলেন, 'আমায় নিলে ত্রিভুবেনশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে....তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে/ তবু আমার হৃদয় লাগি/ ফিরছ কত মনোহরণ বেশে/ প্রভু নিত্য আছ জাগি।' আবার কোথাও বলেছেন, 'তব সিংহাসনের আসন হতে, এলে তুমি নেমে/ মোর বিজন দ্বারের কাছে দাঁড়ালে, নাথ, থেমে।।'

ঈশ্বর সাধনার আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উল্লেখ করে বলেছেন পূজার উপকরণ সংগ্রহ করে, মন্দিরে গিয়ে দেবতাকে সাজাতে আমরা খুব ব্যাস্ত থাকি। তার ফলস্বরূপ আমাদের সাজানো ফুলের মালা, দীপের আলো, ধূপের ধোঁওয়া ভেদ করে আমরা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারিনা। রবির প্রস্তাব হল, মন্দিরে যাওয়ার বদলে আমরা যদি নিজেদের মনের একটি কোণে সেই দেবতার আসন পেতে সরল প্রাণে, নীরব হয়ে তাকে ডাকি, তাহলে সেই মন-মন্দিরে ঈশ্বরের স্পর্শ পাওয়া অনেক সহজ হয়ে যাবে। তাঁর অন্তর্যামীকে খোঁজার আরো একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল নিজেকে জানার যে কর্মকাণ্ড তার সঙ্গে তিনি যোগ করে দিলেন সেই অন্তর্যামী কে জানাটাও। বললেন, 'সেই জানারি সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।' লক্ষ্য করা যায়, 'আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে'. গানটির শেষ অংশে কবি এক নাটকীয় পরিবেশ রচনা করেছেন। লিখেছেন, 'হঠাৎ খেলার শেষে আজ কী দেখি ছবি/ স্তব্ধ আকাশ, নীরব শশী রবি/ তোমার চরণ-পানে নয়ন করি নত/ ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত।।'

ঈশ্বর প্রেমে কতখানি নিমজ্জিত হলে একটি সত্তা বলতে পারে, 'তব জীবনের আলোতে জীবনপ্রদীপ জ্বালি,/ হে পূজারী, আজ নিভৃতে সাজাব আমার থালি।' জগতের আনন্দযজ্ঞে নিমন্ত্রণ পেয়ে কবি তাঁর প্রভুকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, তাঁকেও সেই যজ্ঞেব অংশীদার করে নেবার জন্য। জীবনদেবতাকে কবি জানিয়েছেন, বিশ্বতানের সঙ্গে তিনি যে ধ্রুবপদ বেঁধে দিয়েছেন, ভক্তরূপে তিনি তাঁর জীবনগান দিয়ে সেই তান মেলাবার প্রচেষ্টা করবেন। কবি তাঁর বিশ্বরাজের অরূপবীণা অহরহ শুনেছেন রূপের আড়ালেযা বেজে উঠেছে তাঁর হৃদয়মাঝে।তিনি আকাশজুড়ে সকল তারার মাঝে শুনতে পেয়েছেন তাঁর জীবনস্বামীর নাম। সেই নাম আবার কখন শান্তি-ধারা হয়ে নেমে এসে ললাট স্পর্শ করে তাঁর সমস্ত বেদনা দূর করে দিয়েছে। সখা-রূপী ঈশ্বরের সঙ্গে এতটাই নিবিড় সম্পর্ক তিনি গড়ে তুলেছিলেন যে দ্বিধাহীন ভাবে তাঁর কাছে দাবি জানিয়ে বলেছেন, যদি কখনো তাঁর হৃদয়-দুয়ার বন্ধ থাকে তাহলেও যেন তাঁর প্রভু ফিরে না গিয়ে, সেই দ্বার ভেঙ্গে তাঁর হৃদিমধ্যে প্রবেশ করেন।

জীবনে নানা দুঃখ বেদনার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিরসখার উপস্থিতি অনুভব করেছেন। লিখেছেন, 'দুখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে/ যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করে ধরিব হে।' আর এক জায়গায় লিখলেন, 'তোমার হাতের বেদনাব দান এড়ায়ে চাহি না মুকতি/ দুখ হবে মম মাথার ভূষণ সাথে যদি দাও ভকতি'। যে ঈশ্বরকে তিনি সখা, বন্ধু, প্রিয়তম বলে জ্ঞান করেছেন, তাঁর কাছেই আবার বিনীত অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন, 'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা/ বিপদে আমি না যেন করি ভয়।'

কবির ঈশ্বর কল্পনায় লক্ষ্য করা যায় অসাধারণ বৈচিত্র্য। অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত যে আলো, তাকেও তিনি দেখেছেন ঈশ্বরের আলোরূপে। বলেছেন সবাইকে নিয়ে, সবার মাঝে লুকিয়ে আছেন যে প্রাণসখা, তিনি কবির একান্ত আপনজন।

তাঁর সেই জগপতির কাছে একান্ত নিবেদনের কথা শুনতে পাই যখন তিনি গাইলেন, 'প্রণমি তোমারে চলিব নাথ, সংসার কাজে/তুমি আমার নয়নে নয়ন রেখো অন্তরমাঝে।।' অথবা যখন লেখেন, 'তোমার এ ভবে মম কর্ম যবে সমাপন হবে হে/ ওগো রাজরাজ, একাকী নীরবে দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।' জীবনবল্লভ কে সাধনদুর্লভ আখ্যা দিয়ে লিখলেন, 'আমি মর্মের কথা অন্তরব্যথা কিছুই নাহি কব/ শুধু জীবন মন চরণে দিনু বুঝিয়া লব সব।/ আমি কী আর কব।।'

আমরা জানি কবি মৃত্যুকে দেখেছিলেন অসম্ভব সুন্দর রূপে। তিনি দেখেছিলেন মৃত্যুর অপর পারেও তাঁর বন্ধু তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছেন। তাই লিখলেন, 'জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে/ বন্ধু হে আমার রয়েছো দাঁড়ায়ে।' আরো ব্যাখ্যা করে বললেন ঈশ্বরের এই অসীম ব্যাপ্তির মধ্যে আমরা যত দূরেই যাই না কেনসেখানে দুঃখ আছে কিন্তু কোনো বিচ্ছেদ নেই। ঈশ্বরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকার জন্যই এই মৃত্যু-বিয়োগ-ব্যথা আমাদের মনে গভীর আঘাত হানে। লিখলেন অনবদ্য গানে'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই/ কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।।'

একশচুয়ান্নতম জন্ম-জয়ন্তীতে সেই ঋষি-প্রতিম অসাধারণ ব্যক্তিত্ব কে জানাই আমার প্রণাম।

শান্তিনিকেতনে বর্ষবরণ উৎসব

শান্তিনিকেতন। উপাসনা গৃহ।

১ পাতার পর

এবারও নববর্ষ উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম ১৪ই এপ্রিল। আশ্রমের কাছেই একটি গেস্ট হাউসে থাকি, যাতে করে পায়ে হেঁটেই সবসময় আশ্রমে আসতে পারি। সেদিনই সন্ধ্যা সাতটায় 'বর্ষ বিদায়ের মন্দির' পালিত হয়। সাঁঝের মন্দির প্রাঙ্গণ আলোক সজ্জায় সজ্জিত হয়ে ওঠে। রঙিন কাচের মন্দিরের শোভা, শান্ত ও সমাহিত সন্ধ্যায় আশ্রমের পরিবেশ অবর্ণনীয়। ঠিক সন্ধ্যা সাতটায় মন্দিরের ঘণ্টা বাজতে আরম্ভ করে। বৈদিক মন্ত্র, সমবেত ও একক সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে প্রার্থনা আরম্ভ হয়ে থাকে। পুরনোকে বিদায় জানিয়ে সেখানেই নতুনকে প্রতিষ্ঠা করাতেই জীবনের সফলতা। বিদায়ী বর্ষের সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়কে স্বীকার করে নতুন বছরের দিকে পা বাড়ানোই লক্ষ্য। আচার্য্যদেব তাঁর ভাষণে এই প্রার্থনা জানান। ঠিক আটটায় 'মন্দির' শেষ হয়।

১৫ই এপ্রিল নববর্ষের সকালে, ভোর পাঁচটায় আশ্রম প্রদক্ষিণ করে বৈতালিক হয় -- ''ভেঙ্গেছো দুয়ার/এসেছো জ্যোতির্ময়/তোমারিই হউক জয়,'' এই গানটি দিয়ে। সকাল আটটায় আমরা সাদা পরিধানে মন্দির প্রাঙ্গণে জড়ো হয়েছিলাম। অপূর্ব রঙ্গীন আলপনা, ফুলের তোড়াতে মন্দির সাজানো হয়েছিল। বিশ্বভারতীর উপাচার্য্যই আচার্য্য পদে উপস্থিত ছিলেন। বৈদিক মন্ত্র এবং রবীন্দ্রনাথের রচিত নববর্ষের প্রার্থনা পাঠ করলেন। বেশ কিছু সমবেত ও একক প্রার্থনা সঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছিল। নটায় মন্দির শেষ হয়েছিল।

এরপর রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উদ্‌যাপন হল পুরনো ঘণ্টা তলায়। শালবীথিতে আমরা সবাই সমবেত হলাম। আনন্দ পাঠশালার শিশুদের গান, পাঠভবনের ছেলেমেয়েদের গান-পাঠ-কবিতা, সঙ্গীতভবনের ছাত্রছাত্রীদের গান -- সব মিলিয়ে এক ঘণ্টা একটি জমজমাট অনুষ্ঠান। মাস্টারমশাইদের প্রণাম করলাম, পরিচিত মুখ দেখে, অনেক গল্পগুজবের মধ্যে দিয়ে আনন্দে মেতে রইলাম। নববর্ষের সান্ধ্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল গৌড় প্রাঙ্গণে — 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্য। শ্রীনিকেতনের স্কুল শিক্ষাসত্রের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে গান ও নাচের মাধ্যমে 'তাসের দেশ' অভিনয় করল। সমবেত অসংখ্য দর্শক মুগ্ধ হয়ে তা দেখেছিল।

এরপরে রাত্রিবেলা নটার সময় বিচিত্রা গৃহে শাস্ত্রীয় গানের অনুষ্ঠান। পণ্ডিত অলোক চট্টোপাধ্যায় তাঁর ধ্রুপদী কণ্ঠে গান পরিবেশন করলেন। ১লা বৈশাখের সারাটা দিন যে সাংস্কৃতিক মননের সঙ্গে কাটিয়েছিলাম — তা আমার জীবনে এক পরমপ্রাপ্তি।

সংঘ সংবাদ

সেবক প্রতিবেদন: গত দু-মাসে গান্ধী সঙ্ঘের নিয়মিত কার্যকলাপের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল:-

১) অ্যালোপ্যাথি বিভাগে মার্চ মাসে ৩৩৭ জন রোগী উপযুক্ত সেবা পেয়েছেন।

২) হোমিওপ্যাথি বিভাগে মার্চ মাসে ৭৫০ জন রোগী ও এপ্রিল মাসে ৬৩০ জন মানুষ ডাক্তার দেখিয়ে ঔষধ নিয়ে উপকার পেয়েছেন।

৩) বৃহস্পতিবার বিকেলের চক্ষুবিভাগে দু'মাসে প্রায় ২০ জন রোগী চোখ দেখিয়েছেন।

৪) সোমবার সকাল বেলার চক্ষুবিভাগে অনেক দূর থেকে রোগীরা এসে থাকেন। যেমন বারাসাত, মধ্যমগ্রাম, রাজারহাট প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষেরা। মার্চ মাসে ১১০ জন রোগী চোখ দেখিয়ে উপকৃত হয়েছেন এবং তাঁদের থেকে ৪৫ জনকে চশমা দেওয়া হয়েছে। চোখের অপারেশন হয়েছে ৫ জন রোগীর।

গান্ধী সেবা সংঘের ''মাণিক্য মঞ্চ''-টি সঙ্ঘের বিভিন্ন রকম সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ, সভার জন্য নিয়মিত ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও শ্রীভূমি, লেকটাউন, কালিন্দি, গ্রীনপার্ক -- এই সমস্ত অঞ্চলের বেশ কিছু মানুষ ও সংস্থাও এখানে নিয়মিত অনুষ্ঠান করে থাকে। যেমন --

১) ৪.১.২০১৫ তারিখে সুর ও চিত্র মহল সংস্থার ছাত্রছাত্রীরা মনোরম সঙ্গীতানুষ্ঠান করেছিলেন।

২) ওই দিনই 'দেশকাল' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্যামল ঘোষ মহাশয় একটি অভিনব ও অতি মনোরম, তথ্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। 'মধুচাষী' এবং 'দমদমের ইতিহাসে'র ওপর একটি বিশেষ তথ্যচিত্র পরিবেশন করেছিলেন। এছাড়াও বেশ কয়েকজন স্বনামধন্য ডাক্তার, সাহিত্যিক, সমাজসেবী এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত কিছু সেবা-কর্মীকে তিনি সংবর্ধনা দেন। তাঁর এই অভিনব প্রয়াসকে সঙ্ঘের পক্ষ থেকে সাধুবাদ জানাই।

৩) শ্রীভূমি মহিলাবৃন্দ ১.৪.২০১৫ তারিখে পাড়ার শিশুদের নিয়ে শিশুদিবস পালন করেন। শিশুরা সেদিন নাচ, গান, কবিতা পাঠের মাধ্যমে দর্শকদের মনোরঞ্জন করে।

এরপর ৮ পাতায়

পানীয় জল, ফ্লোরাইড এবং দূষণ – কিছু বক্তব্য

ডঃ দিলীপ কুমার দাস

পূর্ববর্তী লেখার পর

কলকাতা এবং তার কাছাকাছি কোন অঞ্চলে অধিকমাত্রায় ফ্লোরাইড আয়ন যুক্ত পানীয় জল, তার কোন authentic খবর এখনও পর্যন্ত reported হয়নি। তবে এটা ঠিক যে এই মৌলটি arsenic-এর মতই অতীব বিষাক্ত যার মানব শরীরে বিরূপ প্রভাব ভীষণভাবে ক্ষতিকারক। Arsenic-এর বিষক্রিয়ার প্রভাব সব মানুষের শরীরে একইভাবে প্রকাশ পায় না। আমি আমার চাকরি জীবনে এই মৌলপদার্থটি নিয়ে বীরভূম জেলার নলহাটি ব্লকে কাজ করার সময় নিজের চোখে "fluorosis"-এ আক্রান্ত লোকদের দেখেছি এবং তাঁদের দৈনিক ব্যস্ততা ও শারীরিক সমস্যার কথা বিশদভাবে আলোচনা করেছি। আমি লক্ষ করেছি যে একই পরিবারের সকলেই এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় না যদিও তারা PHE-র drill করা একই deep tube well-এর জল পান করে যার ফ্লোরাইডের মাত্রা সহনশীলতার চেয়ে অনেক বেশী। তবে তারা যে ভবিষ্যতেও আক্রান্ত হবে না তার কোন গ্যারান্টি দেওয়া যায় না। আরও একটি উল্লেখযোগ্য ও লক্ষণীয় ব্যাপার হল যে "fluorosis"-এ আক্রান্ত রোগী এবং "arsenocosis"-এ আক্রান্ত রোগীর শারীরিক বহিঃপ্রকাশের লক্ষণ (symptom) সম্পূর্ণ আলাদা যা আক্রান্ত ব্যক্তিদের দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু arsenocosis-এর ভয়াবহতা fluorosis-এর চেয়ে অনেকগুণ বেশী। এতক্ষণ কেবল মাত্র পানীয় জলের মাধ্যমে ফ্লোরাইড আয়ন মানব শরীরে প্রবেশ করে কীভাবে "fluorosis"-এ আক্রান্ত হয় তার কিঞ্চিৎ আলোচনা করলাম। কিন্তু পানীয় জল ছাড়াও অন্যান্য মাধ্যমের সাহায্যেও এই বিষাক্ত মৌলটি শরীরে প্রবেশ করে এবং "fluorosis"-এ আক্রান্ত হতে পারে। বাজারে বিভিন্ন readymade খাবার এবং পানীয়-এ fluoride যুক্ত mineral-এর আধিক্য দেখা যায়। এগুলির মাধ্যমেও এই মৌলটি শরীরে প্রবেশ করে প্রতিদিন। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহৃত "Rock Salt" একটি খনীজ পদার্থ থাকে (বাজারে ''সৈন্ধক লবণ'') নামে পরিচিত। এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফ্লোরাইড যুক্ত খনীজ পদার্থ থাকে। এই লবণটিকে বিক্রিত খাবারে taste আনার জন্য সামান্য বা তার একটু বেশী পরিমাণে দেওয়া হয় (সাধারণত ফুচকা বা পানীপুরী, পাপড়ি চাট, চানাচুর, আলুকাবলি, বড়া, হজমীগুলি, হজমোলা, চিনাবাদাম, পাওভাজি, french fry, ঘুগনী, chips, ইত্যাদি বিভিন্ন fast food-এর মধ্যে এই লবন দেওয়া থাকে) এই খাবারগুলির বিক্রি বর্তমানে বেশ বেশী। আমরা প্রায় অনেকেই এই লবণযুক্ত খাবার রোজ নানাভাবে গ্রহম করি। বহুদিন ধরে একনাগারে খাওয়ার ফলে শরীরে ফ্লোরাইড আয়নের মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে সহনশীলতার মারার বেশ উপরে যাওয়ার পলে নানা রকম রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটার সম্ভাবনা থাকে। তার মধ্যে "fluorosis" হওয়ার সভাবনা অন্যতম। আমারা অনেকেই black tea নিয়মিত পান করে থাকি।

[শেষ]

বিশেষ সংবাদ: গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালের বর্হিবিভাগের খবরাখবর

সেবক প্রতিবেদন: অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি -- আগামি ২৪শে মে, রবিবার, সকাল ৯.৩০ মিনিটে আমাদের গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালের বর্হিবিভাগ আরম্ভ হচ্ছে গান্ধী সেবা সঙ্ঘের মূল ভবনে। এই গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালের বর্হিবিভাগ খোলা থাকবে -- সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত এবং বিকেলে ৪টে থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

এখানে রেজিস্ট্রেশন ফী বাবদ লাগবে যথাক্রমে:
1) Family physician Rs. 100/-
2) For Specialist Rs. 150/-
3) For Super Specialist Rs. 200/-

নাম নথিভুক্তের জন্য যোগাযোগ করতে হবে: 99033 84777, 2521 4011

বিশেষ খোঁজ নিতে যোগাযোগ করতে হবে: 9432000260

আপতভাবে যে সমস্ত ডাক্তারদের পরিষেবা নেওয়া যাবে তাঁরা হলেন:

NAME OF DOCTORS	SPECIALTY
1. DR. T. K. CHATTA RAJ	Medicine (MD)
2. DR. DEBARSHI ROY	ENT (MS,MRCS)
3. DR. DEBASIS ROY	Surgeon (MS, MRCS)
4. DR. PARTHA MITRA	Gynecologist (DGO, MD)
5. DR. SUDIPTA BANDYOPADHYAY	Orthopaedician (MS)
6. DR. SWAPAN DE	Cardiologist (MD,DM)
7. DR. SUBHABRATA GANGULY	Gastro (MD.DM)
8. DR. SABYASACHI ROY	Gastroenterologist (MRCP)
9. DR. SOMNATH BHAR	Medicine (MRCP)
10. DR. MALOY MONDAL	Orthopaedic (MS)
11. DR. SUMIT SANYAL	Onco & Gastro Surg. (MS)
12. DR. SUBHADIP PAL	Medicine and Critical Care (MD, MRCGP)
13. DR. RUPNARAYAN BHATTACHARYA	MS (Ortho) MCH (Plastic)
14. DR. SUDIPTA CHATTOPADHYAY	MD
15. DR. SUMANTRA RAUT	MD (PED)
16. DR. P. S. KARMAKAR	MD (MED)
17. DR. SUMIT ACHARYA	MRCP (CARD)
18. DR. SAIBAL MAITRA	MS (OPTH)
19. DR. (PROF) ANUP MAJUMDER	MD (ONCO)
20. DR. (PROF) HIRANMOY MUKHOPADHYAY	MD (MED, PHD)
21. DR. ARUP HALDER	MD (CHEST)
22. DR. SUJAN BARDHAN	MD (CHEST)
23. DR. SANTOSH KUMAR	MS (ORTHO)
24. DR. ANIRBAN KUNDU	MBBS, DIP (CARD)
25. DR. MOUMITA BAGCHI	MD (MED)
26. DR ASHIM MALLIK	MD (PSYCHO)
27. DR. SOUGATA BANDHOPADHYAY	MD, MRCPsych
28. DR. TRINA SENGUPTA	DGO, DND
29. DR. BISWANATH SANTRA	MBBS, DRCOG, GYNO
30. DR. (PROF) AJIT SAHA	MS, DLO (LOND), ENT

Nanda Banik
(033) 40067096
(033) 25212529
9831096930
LAKSHMI IRON
TATA IRON, BUILDING MATERIALS & GENERAL ORDER SUPPLIES
P-7, LAKE TOWN, BLOCK-B, KOLKATA-700 089

ইস্ট কোলকাতা
কালচারাল অর্গানাইজেশন
রবীন্দ্রনাথের ১৫৪তম জন্মবার্ষিকীতে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী
"তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে
এ আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে"
নির্মল শিকদার (সম্পাদক)
৯৮৩০০৪৯৭৩৮

সংঘ সংবাদ

৭ পাতার পর

৪) ১৫.৪.২০১৫-তে 'পরমাণু' সংস্থার আয়োজনে প্রয়াত নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতা শ্রী শেখর রঞ্জন সরকার মহাশয়ের স্মৃতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

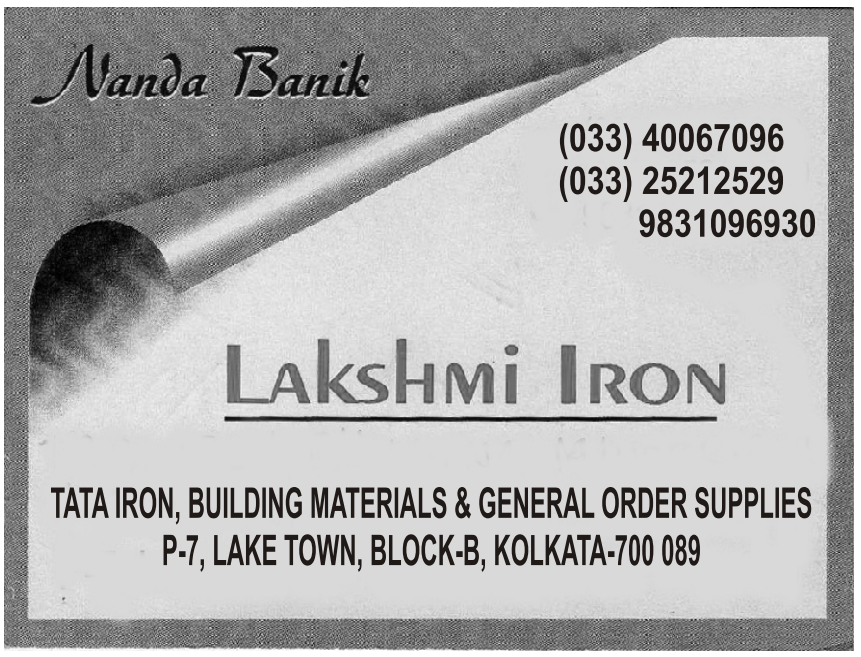

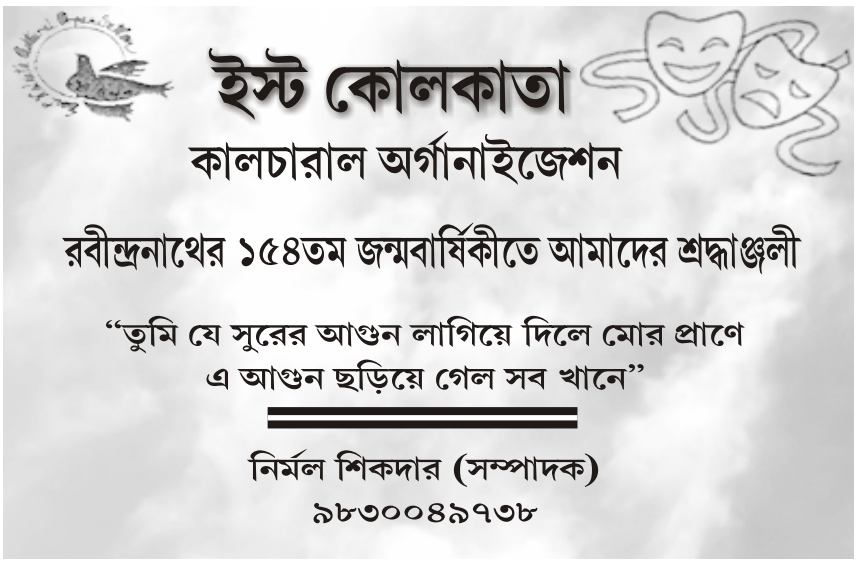

৫) "An Evening With Classical Music" নামক একটি সংস্থা ২৯.৪ .২০১৫-তে একটি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

৬) সত্যেন্দ্র আর্ট এবং যোগা ও সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট ৮ই এপ্রিল থেকে ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত একটি চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করে। শতাধিক ছবি প্রদর্শনে এবং দর্শকরা অভিভূত হয়েছিলেন।

৭) ২৫.৪.২০১৫-তে ভীষ্মদেব মেমোরিয়াল ট্রাস্ট শাস্ত্রীয় সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। তাতে ওই সংস্থার ছাত্রছাত্রীরা সকলেই সামীল হন এবং দর্শকদের অভিভূত করেন।

আমাদের ওয়েবসাইট
gandhisevasangha.org
দেখুন এবং সংস্থায় সাহায্য করুন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল নির্মাণ কার্যে সহায়তা করেছেন যাঁরা

১) শ্রী সুধীর ভট্টাচার্য্য	৫০,০০০/-
২) শ্রী প্রবীর গুহঠাকুরতা	২৫,০০০/-
৩) শ্রীমতি রীতা ঘোষ দস্তিদার	২৫,০০০/-
৪) শ্রী শঙ্করলাল ঘোষাল	১০,০০০/-
৫) শ্রী অনিরুদ্ধ ঘোষ	১০,০০০/-
৬) মুক্তি বেন মেমোরিয়াল	১১,০০০/-
৭) শ্রী সুব্রত পাল	১০,০০০/-
৮) শ্রীমতি আভেরী গুহঠাকুরতা	১০,০০০/-
৯) প্রোফেসর অপূর্ব কুমার দাস	৫,০০০/-
১০) রসময় চক্রবর্তী (পুনে)	৫,০০০/-

ক্রমশঃ

AGNI
AGNI POWER & ELECTRONICS PVT. LTD.
Leader in Solar PV Engineering
An ISO 9001 :2008 and OHSAS: 18001 : 2007 Certified Company
MNRE, Govt. Of India
Accreditated Channel Partner
HEAD OFFICE:
114, Rajdanga Gold Park (1st floor), Kolkata-700 107
Tele Fax: (091) (33) 4005-1193/4061-0038
E-mail: Info@agnipower.com/Web: www.agnipower.com

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের পক্ষে সুব্রত পাল কর্তৃক ২০৭/১, এস কে দেব রোড, কলকাতা-৪৮ থেকে প্রকাশিত ও মাল্টিমেড ক্রিয়েট, সি এ ৫/১৩, দেশবন্ধুনগর, কলি-৫৯ হইতে মুদ্রিত
১ম বর্ষ ● ৫ম সংখ্যা। সম্পাদক: **জবা গুহঠাকুরতা** sebakpatrika @ gmail.com